হিটলার

উৎসর্গ

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন মধুমাস,
পূরবী গেয়ে ভোলালি তোরা,
চাইনে তো বিভাস !

বাণীর একনিষ্ঠা সাধিকা
অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বধূ
কল্যাণীয়া
শ্রীমতী অর্চ্চনা
তথা
পুত্রপ্রতিম অপিচ দিলের দোস্ত
নূর-ই-চশ্‌ম
শ্রীমান দ্বারিক মিত্রের
চতুর্ভদ্র করকমলে

রথযাত্রা, ১৩৪৭
কলকাতা।

আনকূল্‌
সৈয়দ মুজতবা আলী

হিটলারের শেষ দশ দিবস

ঠিক কুড়ি বৎসর আগে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটের অল্প পূর্বে হিটলার তাঁর অ্যার-রেড্ শেল্টার (বুঙ্কার—মাটির গভীরে কন্‌ক্রিটের পঞ্চাশ ফুট ছাতের নিচের আশ্রয়স্থল—কামানের বা প্লেন থেকে ফেলা গোলা বুঙ্কারের গর্ভ পর্যন্ত কিছুতেই পৌছতে পারে না) থেকে বেরিয়ে করিডরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নব-পরিণীতা বধূ এফা, প্রায় পনেরো বৎসরের 'বন্ধুত্বে'র (হিটলারের শেষ উইলে তিনি এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন—বস্তুত নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক-জন অনুচর ভিন্ন দেশের-দশের লোক জানত না যে হিটলার ও এফার মধ্যে সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর) পর তিনি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে এঁকে বিয়ে করেছেন। করিডরে গ্যোবেল্‌স্, বরমান প্রভৃতি প্রায় পনেরোজন তাঁর নিকটতম মন্ত্রী, সেক্রেটারি, সেনাপতি, স্টেনো, খাস অনুচর-চাকর সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হিটলার ও এফা নীরবে একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর নিতান্ত যে ক'জনের প্রয়োজন তাঁরা করিডরে রইলেন—বাদ-বাকিদের বিদায় দেওয়া হল। হিটলার ও এফা খাস কামরায় ঢুকলেন। অনুচররা বাইরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটিমাত্র পিস্তল ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। অনুচররা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন—তাঁরা ভেবেছিলেন দুটো শব্দ হবে। সেটা যখন শোনা গেল না তখন তাঁরা কামরার ভিতরে ঢুকলেন। সেখানে দেখতে পেলেন, তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন, কিংবা পড়ে আছেনও বলা যেতে পারে। তাঁর খুলি, মুখ এবং যে সোফাটিতে তিনি বসেছিলেন সব রক্তাক্ত। কেউ কেউ বলেন, তিনি মুখের ভিতর পিস্তল পুরে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ বলেন, কপালের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে। তার কাঁধে এফার মাথা হেলে পড়েছে। এফার কাছেও মাটিতে একটি ছোট পিস্তল। কিন্তু তিনি সেটা ব্যবহার করেননি। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

তারপর কুড়িটি বৎসর কেটে গেলে পর ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই সেদিনের স্মরণে ও তার সপ্তাহ খানেক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার উপলক্ষে বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

আমার কাছে আসে প্রধানত জর্মনি, অস্ট্রিয়া ও সুইটজারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত জর্মন ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক। এগুলোর আসতে প্রায় দু' মাস সময় লাগে। অ্যার-মেল হওয়ার ফলে বুকপোস্ট, ছাপা-মাল যে কী জঘন্য শম্বুক

গতিতে আসে সে-কথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তর্ধান করেন। কেউ কেউ ধরা পড়েন রাশানদের হাতে। তার মধ্যে হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙেও ছিলেন। কেউ কেউ লুকিয়ে থাকেন মার্কিন-ইংরেজ-ফরাসী অধিকৃত এলাকায়। এঁরাও ধরা পড়েন, প্রধানত মার্কিনদের দ্বারা। আর কারো কারো কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। যেমন বরমান ইত্যাদি কয়েকজন। এঁদের কে কে পালাবার সময় হত হন বা পালাতে সক্ষম হন জানা যায়নি।

গোড়ায়, অর্থাৎ হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পর রুশ জঙ্গীলাট জুকফ প্রচার করেন যে, হিটলার এফা ব্রাউনকে বিয়ে করার পর আত্মহত্যা করেন। ওদিকে মস্কোতে বসে স্তালিন বলেন, হিটলার মরেননি, তিনি ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কোর আশ্রয়ে স্পেনে আছেন (স্তালিনের মতলব ছিল এই অছিলায় ইয়োরোপের শেষ ফ্যাশী ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কোকে খতম করা)। এমন কি কোনো কোনো উচ্চস্থলে একথাও বলা হল যে, ইংরেজ (!) তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। ইংরেজকে তখন বাধ্য হয়ে পাকাপাকি তদন্ত করতে হয় যে হিটলার সত্যই বুঙ্কার থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি না, কিংবা তিনি মারা গিয়েছেন কি না। এ কাজের ভার দেওয়া হয় ইতিহাসের অধ্যাপক, যুদ্ধকালীন গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ট্রেভার রোপারকে।

তিনি তাঁদেরই সন্ধানে বেরুলেন যাঁরা হিটলারের সঙ্গে বুঙ্কারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। এঁদের কয়েকজন হিটলারের মৃত্যু, দাহ, অস্থি-সমাধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু বুঙ্কার ও তৎসংলগ্ন ভূমি তখন রাশানদের অধিকারে (পূর্ব বার্লিনে); তারা সেখানে অধ্যাপককে কোনো অনুসন্ধান করতে দিল না। হিটলারের যে সব সাঙ্গোপাঙ্গ রাশানদের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা যে সব জবান-বন্দি দেন সেগুলোও অধ্যাপককে জানানো হল না।

হিটলারের মৃত্যুর সাত মাস পরে ট্রেভার রোপার তাঁর রিপোর্ট সরকারের হাতে দেন ও সেটি প্রকাশিত হয়। এর পর আরো তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু অধ্যাপক তাঁর ময়না-তদন্তে যে বর্ণনাটি দেন তার বিশেষ কোনো রদ্‌-বদল করার প্রয়োজন হয়নি। এসব মিলিয়ে ট্রেভার রোপার সর্বসাধারণের জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা করে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত করেন। তার নাম 'লাস্ট্‌ ডেজ্‌ অব হিটলার।'

এ পুস্তিকা ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষাতেই অনূদিত হয়, এবং তার যুক্তিতর্ক এমনই অকাট্য যে জনসাধারণ হিটলারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। ওদিকে

সরকারী রাশান মত—হিটলার মারা যাননি।—তাই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে বইখানি নিষিদ্ধ বলে আইনজারী করা হল।

কিন্তু শেষটায় রাশানদেরও স্বীকার করতে হল যে হিটলার জীবিত নেই। কাশীরাম দাস পূর্বেই বলে গেছেন :—

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্তালিনকে প্রায় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকর্তার আসনে তুলে 'দি ফল্ অব বার্লিন' ফিল্ম্ রাশাতে তৈরী হল। এ ছবি এদেশেও এসেছিল। এতে হিটলারের মৃত্যু যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেটা মোটামুটি ট্রেভার রোপারের বর্ণনাই। মাত্র একটি বিষয়ে তফাত। ছবিতে দেখানো হয়েছে হিটলার বিষ খেয়ে মরলেন—অথচ হিটলার যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের কারণ কি তাই নিয়ে অধ্যাপক তাঁর পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে সবিস্তর আলোচনা করেছেন—এ স্থলে সেটা নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস, to make assurance doubly sure হিটলার বিষের পিলে কামড় ও পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন একই সঙ্গে।

রুশদেশে দশ বছর জেল খাটার পর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে হিটলারের কয়েকজন পার্শ্বচর মুক্তি পান। তার ভিতর একজন হিটলারের ভ্যালে লিঙে। ইনি বেরিয়ে এসেই দীর্ঘ একটি বিবৃতি দেন। এদেশের অমৃতবাজার পত্রিকায়ও সেটি ধারাবাহিক বেরয়। অন্যজন হিটলারের এ্যাড্জুটাণ্ট গ্যুন্শে। ইনি ও লিঙে যে সব বিবৃতি দিলেন, সেগুলোর সঙ্গে অধ্যাপকের বইয়ে গরমিল অতি কম, এবং তাও খুঁটিনাটি নিয়ে।

অধ্যাপকের 'লাস্ট্ ডেজ্ অব হিটলার' বেরনোর পর ঐ বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, কিন্তু মোটামুটি সকলেই অধ্যাপকের উপর নির্ভর করেছেন।

* * *

আমি প্রথম জর্মনি যাই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। হিটলার তখনো গোটা জর্মনিতে সুপরিচিত হননি। তাঁর কর্মস্থল ও খ্যাতি প্রধানত ছিল ম্যুনিক অঞ্চলে। তারপর আমার চোখের সামনেই তিনি রাইষ্টাগে (জর্মন পার্লিমেণ্টে) তাঁর দলের ক্ষমতা অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ালেন। ১৯৩২-এ আমি দেশে ফিরে এলুম। ৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর—প্রধানমন্ত্রী, প্রধান কর্মকর্তা হলেন। ১৯৩৪-এ আমি আবার প্রায় এক বছর জর্মনিতে ছিলুম। তখন হিটলার কিভাবে রাজ্যশাসন করেন সেটি পুরোপুরি দেখলুম। ১৯৩৮-এ আমি আবার জর্মনিতে চার

মাস কাটালুম। চেম্বারলেন তখন হিটলারের কাছে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগলো। বিশ্বযুদ্ধের পর আমি হিটলার ও তাঁর রাজ্যশাসন (থার্ড রাইখ একেই বলা হয়, এবং হিটলার সদম্ভে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, তৃতীয় রাইখ, এক হাজার বছর স্থায়ী হবে—কিন্তু তার আয়ুষ্কাল হল মাত্র বারো বছর তিন মাস!) সম্বন্ধে শত শত বই কিনি। জর্মন, মার্কিন, ফরাসী, ইংরেজ ইত্যাদির লেখা। এদের সকলেই হয় হিটলারের পক্ষে না হয় বিপক্ষে ছিলেন। আমাকে নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। যুদ্ধের পরও আমি দু'বার জর্মনি ঘুরে আসি।

এস্থলে হিটলারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার দম্ভ আমার নেই। উপরের কয়েক ছত্র থেকে পাঠক শুধু যেন বুঝতে পারেন আমার মিত্রেরা কেন আমাকে হিটলার সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক লিখতে বলেন। আমারও সেই বাসনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি সেটা আর হয়ে উঠবে না। তাই যেটুকু পারি সেইটুকু এইবেলা লিখে নিই।

অনেক সময় পাঠকের ধৈর্য কম থাকে বলে তিনি উপন্যাসের শেষ অধ্যায়টি পড়ে নেন। আমি শেষ অধ্যায়ই সর্বপ্রথম লিখ্‌ব। পটভূমি—অর্থাৎ প্রথম বাইশ বা বত্রিশ অধ্যায়—নির্মাণ করবো কয়েকটি ছত্রে।

১৯৩৩-এ হিটলার চ্যান্‌সেলর হলেন। ১৯৩৪-এ জর্মনির প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ মারা গেলে তিনি সে আসনটিও দখল করে দেশের 'ফ্যুরার' বা একচ্ছত্রাধিপতি 'নেতা' হন। পার্লিমেন্টের আর কোনো স্বাধীনতা রইল না। ১৯৩৮-এ হিটলার স্বাধীন অস্ট্রিয়া রাজ্য (তাঁর আপন জন্মভূমি ঐ দেশেই) দখল করে 'বৃহত্তর রাইখে'র অংশ করে নিলেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার জর্মন-ভাষাভাষী অঞ্চল গ্রাস করতে চাইলে, শান্তিভঙ্গের ভয়ে ভীত ইংলণ্ডের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ে সে অঞ্চলটুকু তাঁকে লিখিত-পঠিত ভাবে দান করলেন। কয়েক মাস পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার যে অঞ্চল তিনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেইটুকুও কাউকে কিছু না বলে-কয়ে গ্রাস করলেন। তখন চেম্বারলেনের কানে জল গেল—সেও পূর্ণমাত্রায় নয়। ১৯৩৯-এ হিটলার পোলাণ্ডের ভিতর দিয়ে জর্মন পূর্ব প্রাশা সংযুক্ত করার মানসে পোলাণ্ড রাজ্যের কাছে করিডর এবং অন্যান্য এটা-সেটা

দাবী করলেন। ইংলণ্ড আবার মধ্যস্থ হতে চাইল, কিন্তু হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। ইতিপূর্বেই জর্মন তথা বিশ্ববাসীকে সচকিত শঙ্কিত করে তিনি তাঁর জাতশত্রু স্তালিনের সঙ্গে চুক্তি করে পোলাণ্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন উত্তেজিত জনমতের চাপে পড়ে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো কিন্তু পোলাণ্ডকে কোনো সাহায্য পাঠাতে পারার পূর্বেই পোলাণ্ড হেরে গেল।

তার এক বৎসর পর ১৯৪০-এর গ্রীষ্মকালে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করে অত্যল্প সময়েই তাকে পরাজিত করলেন। ফ্রান্সে আগত ইংরেজ বাহিনী প্রাণ নিয়ে কোনো গতিকে স্বদেশে ফিরে গেল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম সব-কিছু ডানকার্ক বন্দরে ফেলে যেতে হল।

হিটলার ইংরেজকে বললেন, 'আর কেন? সন্ধি করো!' ইংরেজ বললে, 'না, তোমাকে খতম করবো।'

হিটলার তখন বিরাট নৌবহর নিয়ে ইংলণ্ড আক্রমণের তোড়জোড় করলেন, কিন্তু শেষটায় দেখা গেল অভিযান নিষ্ফল হলেও হতে পারে। হিটলার সে চিন্তা বর্জন করলেন।

তাঁর চিরকালের বাসনা ছিল রুশ জয় করে বিজিত অংশে জর্মন চাষী মজুর বসিয়ে কলনি নির্মাণ করা।[১] ১৯৪১-এর গ্রীষ্মে তিনি রাশা আক্রমণ করলেন ও রুশ সৈন্য পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটতে লাগলো। হিটলার-বাহিনী মস্কোর দোরের গোড়ায় পৌছল। কিন্তু হিটলারের কপাল মন্দ। অসময়ে নেমে এল প্রচণ্ড শীত, বরফ আর বৃষ্টি। পরের বৎসর হিটলার-সৈন্য অভিযান করলো ককেশাসের তেল দখল করতে। সেখানে স্তালিনগ্রাদে জর্মনরা খেল তাদের প্রথম মোক্ষম মার। ওদিকে হিটলারের মিত্র জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার ফলে আমেরিকাও যুদ্ধে নামল। মার্কিনদের এক দল গেল জাপানকে হারাতে; অন্য দল ইংরেজ সহ উত্তর আফ্রিকায়। সেখানে রমেল প্রায় মিশর আক্রমণ করে সুয়েজ দখল করতে যাচ্ছিলেন। মার্কিন-ইংরেজ সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা দখল করে নামলো জর্মনমিত্র মুসোলীনির মুল্লুক ইতালিতে।

---

১ জর্মন রাষ্ট্রের নেতা (ফ্যুরার) হওয়ার বহু পূর্বে তাঁর একমাত্র বই হিটলার লেখেন 'মাইন কাম্প্‌ফ্‌' নাম দিয়ে। এ পুস্তকের অন্যতম মূল বক্তব্য: সমুদ্রপারে কলনি নির্মাণের যুগ গেছে (এটা সত্য, এতদিনে সপ্রমাণ হয়েছে); জর্মনিকে রুশদেশ জয় করে সেখানে কলনি স্থাপনা করতে হবে।

ওদিকে ১৯৪৪-এ রুশ বিপুল বিক্রমে জর্মনদের আক্রমণ করে বিজিত রাশা থেকে তাদের খেদিয়ে দিয়ে পৌঁছে গেল পোলাণ্ডে—তারপর জর্মন সীমান্তে। এদিকে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার জাহাজ নিয়ে মার্কিন-ইংরেজ নামল পশ্চিম ফ্রান্সের নরমাণ্ডি উপকূলে (হিটলার যে নৌ-অভিযান করতে সাহস পান নি এরা সেটাই উল্টোদিক থেকে করলে)। হিটলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর রক্ষণ ব্যবস্থা করেছিলেন—সেনাপতিদের মধ্যে রমেলও ছিলেন—কিন্তু দুশমনকে ঠেকাতে পারলেন না। তারা ফ্রান্স জয় করে ১৯৪৫-এর শীতকালে জর্মনি ঢুকে, রাইন নদ অতিক্রম করে বার্লিনের কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ স্তালিনের সঙ্গে মার্কিন-ইংরেজের চুক্তি ছিল, রুশরা প্রথম বার্লিন প্রবেশ করবে। রুশরা বার্লিনের পূর্ব সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এবারে তারা বার্লিন আক্রমণ করবে। এটা এপ্রিলের মাঝামাঝি—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। আর কয়েক দিন পরেই হিটলারের জন্মদিন—২০ এপ্রিল।

২০ এপ্রিল। আজ ফ্যুরারের জন্মদিন। তিনি কি জানতেন, দশ দিন পর তাঁকে নিজের হাতে নিজের জীবন নিতে হবে? না; কারণ ২৯ এপ্রিল রাত্রেও তিনি জেনারেল ভেংকের খবর নিচ্ছেন; তিনি কবে পর্যন্ত চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন। আবার ২০ এপ্রিলে ফিরে যাই।

হিটলারের আমীর-ওমরাহ, সেনাপতি-জাঁদরেল, সাঙ্গোপাঙ্গ সেদিন সবাই জন্মদিন উপলক্ষে বুঙ্কারে উপস্থিত হয়েছেন। এদের প্রায় সকলেই মনে মনে জানতেন, ফ্যুরারের সঙ্গে এই তাঁদের শেষ দেখা, কারণ রাশানরা তখন বার্লিনের প্রায় চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছে। যে প্রভুকে তাঁরা কেউ ১২ বছর, কেউ ২০ বছর ধরে সেবা করেছেন এবং হিটলার চ্যান্সেলর হওয়ার পর ধনজন-খ্যাতি-খেতাব সব-কিছুই তাঁর অকৃপণ হস্ত থেকে পেয়েছেন—তাঁকে তখন ত্যাগ করতে তাঁদের আর তর সইছে না। কারণ রাশান-ব্যূহ পরিপূর্ণ চক্রাকার ধারণ করার পর তাঁরা আর বেরুতে পারবেন না। তদুপরি বার্লিনের আরো দক্ষিণে রুশ-সেনাবাহিনীর আরেক বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রের প্রায় মাঝখানে এসেছে; মার্কিন-ইংরেজ পশ্চিম থেকে পূর্ব পানে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুই সৈন্যদল হাত মেলালে পর রাইষ দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। ২০ এপ্রিলে তারা তখনো হাত মেলায়নি—দক্ষিণ জর্মনি পৌঁছবার জন্য তখনো একটি করিডর খোলা। বেশীর ভাগই দক্ষিণ জর্মনি যেতে চান। সেখানেই নাৎসি আন্দোলনের জন্মভূমি ম্যুনিক শহর; তার কাছেই হিটলারের আবাসভূমি বের্গহফ—বের্‌ষ্‌টেশ-

গাডেন্ অঞ্চলে, আল্পসের উপরে। সকলেরই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত হিটলার ঐ পর্বতসঙ্কুল গিরি-উপত্যকার গোলকধাঁধাতে এসে তারই সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দুশমনের সঙ্গে লড়ে যাবেন—

কারণ হিটলার একাদিক্রমে বার বার তাঁর সহচরদের বলেছেন : 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এই যে রুশ, মার্কিন, ইংরেজ মৈত্রী এটা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এদের আদর্শ স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। দুই সৈন্যদল মুখোমুখি হতেই এই কোয়ালিশন (মৈত্রী) ভেঙে পড়বে। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের বিরুদ্ধে ঠিক এই রকমই কোয়ালিশন হয়েছিল। তিনিও নিরুপায় হয়ে যখন আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময় কোয়ালিশনের অন্যতম প্রধান নেত্রী রাশার মহারাণী মারা গেলেন। রাশানরা বাড়ি ফিরে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিশন খানখান হয়ে গেল। জর্মনি লুপ্তগৌরব ফিরে পেল এবং উচ্চতর শিখরে আরোহণ করল।'

বুঙ্কারের খাস কামরায় নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস, জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ইয়োডলের কাছ থেকে হিটলার একজন একজন করে জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। বাদবাকিরা—গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপ্, হিমলার (হিটলার এঁরই মারফৎ আইষমানকে ইহুদি-হননে নিযুক্ত করেন), গ্যোবেল্স্, বরমান ইত্যাদির সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। তিনি দৃঢ়নিশ্চয়, বার্লিন মহানগরের সামনে রাশানরা পাবে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়। ভাগ্যবিধাতাই শুধু জানেন, এই সব অপদার্থ চাটুকারদের ক'জন হিটলারের এই অন্ধবিশ্বাসে অংশীদার ছিলেন। কারণ এঁরা সবাই জানতেন, প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে রাশার জারিনার (মহারাণীর) মত প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট মারা গিয়েছেন, কিন্তু মার্কিন সৈন্যদল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেনি।

হিটলার আগের থেকেই জর্মনিকে উত্তর দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিলেন। এখন আদেশ দিলেন, বার্লিনে যাঁদের নিতান্তই কোনো প্রয়োজন নেই তারা হয় উত্তর নয় দক্ষিণ পানে চলে যাবেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমীর-ওমরাহ দক্ষিণ বাগে চললেন—বিরাট বিরাট লরীতে করে দফতরের কাগজপত্র বোঝাই করে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—আপন আপন ধন-দৌলত বোঝাই করে। পড়ে রইল বার্লিনের অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী। আর রইলেন খাঁটি প্রভুভক্ত গ্যোবেল্স্, ক্ষমতালোভী সেক্রেটারী বরমান—হিটলারের 'গরবে তিনি গরবিনী' ; দূরে চলে গেলে সে শক্তি পাবেন কোথা থেকে ? বাদবাকিদের অধিকাংশের সঙ্গে হিটলারের আর দেখা হয়নি। তাঁর দুই প্রধান সেনাপতি

কাইটেল আর ইয়োডল গেলেন বার্লিনের উপকণ্ঠে, সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে; নৌসেনাপতি চলে গেলেন উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র-পারে, তাঁর হেড কোয়ার্টার্সে।

সবাই করজোড়ে হিটলারকে নিবেদন করলেন, আর কয়েকদিনের মধ্যেই রুশ সৈন্য বার্লিনের চতুর্দিকে ব্যূহ স্থাপন করে ফেলবে। ফ্যুরার তাহলে আর দক্ষিণে যেতে পারবেন না। যুদ্ধচালনার হুকুম-নির্দেশ তাহলে দেবে কে? হিটলার কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। অবশ্য এ-কথা সবাই জানতেন, একবার মনস্থির করার পর হিটলার অচল অটল হয়ে রইতেন।

তারপর হিটলার হুকুম দিলেন, বার্লিনে ও বার্লিনের চতুর্দিকে যে সব সৈন্য রয়েছে তারা যেন সবাই একত্র হয়ে এক জোটে সব ট্যাঙ্ক সব জঙ্গীবিমান নিয়ে বার্লিনের দক্ষিণভাগে রুশসৈন্যদের আক্রমণ করে। হিটলার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'কোন সেনাধ্যক্ষ যদি তার সৈন্যকে সম্মুখযুদ্ধে না পাঠায় তবে পাঁচ ঘণ্টার বেশী সে বাঁচবে না।' জঙ্গীবিমানের সেনাপতি কলারকে বললেন, 'তোমার মাথার দিব্যি, কোন সৈন্য যদি রণাঙ্গনে না যায়…।' এস্থলে 'মাথার দিব্যি' অর্থ হিটলার তার মুণ্ডুটির ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালাবার হুকুম দেবেন।

কিন্তু হায়, বাস্তব জগতের সঙ্গে হিটলারের হুকুমের কোনো সাদৃশ্য তখন আর ছিল না। মাসের পর মাস ধরে তাঁর আমীর-ওমরাহ তাঁর কাছে সত্য গোপন করে চলেছেন। যাঁরা সত্য গোপন করেননি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অশেষ ভাগ্যবান, তাঁরা সুদ্ধু অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে বরখাস্ত হয়েছেন, অন্যরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কারাগারে ফাঁসি যাচ্ছেন বা হিটলারের খাসসেনানীর চাবুকে চাবুকে জর্জরিত হচ্ছেন। সত্য গোপন করে হিটলারকে বলা হয়নি, ব্যাটালিয়ানের পর ব্যাটালিয়ান যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে—যেখানে হিটলার ভেবেছেন পুরো ডিভিশন রয়েছে, সেখানে তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ, তিনজন সেপাইয়ে মিলে রয়েছে একটা বন্দুক, টোটার সংখ্যা এতই সীমাবদ্ধ যে শত্রু দশবার গুলি ছুঁড়লে এরা একবার;—হিটলার জানতেন যে জঙ্গীবিমানের পেট্রল কমে আসছে, কিন্তু তারই অভাবে যে শত শত অ্যারোপ্লেন মাটিতেই শত্রুর বোমারু দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে তার পুরো খবর তাঁকে দেওয়া হয়নি।

বুঙ্কারের কনফারেন্স্ রুমের টেবিলের উপর বিরাট জঙ্গী ম্যাপ খুলে হিটলার তাঁর কাল্পনিক সৈন্যবাহিনী, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি লাল নীল রঙীন বোতামের প্রতীক দিয়ে সাজাচ্ছেন আর কোন্ জায়গা থেকে কোন্ সৈন্যদল কোথায় কার

সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কোন্ জায়গায় আক্রমণ করবে তার হুকুম দিচ্ছেন। এসব সেনাপতিদের, এমন কি কোনো কোনো স্থলে কর্নেলদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার কথা—এ সমস্ত তিনি তুলে নিয়েছেন আপন স্কন্ধে। হুকুম দিচ্ছেন মাটির নিচের বুঙ্কারে বসে। যুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন-ইংরেজ বোমারু, জঙ্গীবিমান জর্মনির আকাশে একচ্ছত্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দিন নেই, রাত্রি নেই বেধড়ক বোমা ফেলে ফেলে বার্লিন শহরটাকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হিটলার একদিনের তরে, একঘণ্টার তরেও সরজমিনে অবস্থা তদন্ত করতে বেরননি। পাছে 'বাস্তবতা' তাঁর 'অনুপ্রেরণাকে ব্যাহত করে'। পক্ষান্তরে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জর্মন বোমারু যখন লণ্ডন লণ্ডভণ্ড করছিল তখন প্রায়ই দেখা যেত, বিরাট সিগার মুখে চার্চিল সে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জনসাধারণকে দুঃখের দিনে উৎসাহ দিচ্ছেন—আর তারাও বলছে, 'আসুক না তারা। আমরাও আছি—গুড ওল্ড উইনি'।[২]

বুঙ্কারে হিটলারের জীবনের শেষ ক'দিন সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সময় ও তারিখে ভুল করেছেন। কারণটি অতিশয় সরল। দিনের পর দিন এঁরা বিজলি বাতিতে কাজ করেছেন—মাটির পঞ্চাশ ফুট নিচে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিছুই দেখতে পাননি। তারিখ ঠিক থাকবে কি করে? মাঝে মাঝে তাঁরা প্রায় ভিরমি যেতেন। বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস কলের সাহায্যে বুঙ্কারে ঠেলে দেওয়া হত। কিন্তু বোমাবর্ষণের ফলে বাইরের আকাশে মাঝে মাঝে এত ধুলোবালি জমে যেত যে কল সেগুলোও বুঙ্কারের ভিতর পাঠাতো। তখন বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য কল বন্ধ করে দিতে হত। ফলে অক্সিজেনের অভাবে সবাই নিরুদ্ধনিশ্বাস। বুঙ্কারের ভিতরকার অনৈসর্গিক দূষিত বাতাবরণের—দৈহিক ও মানসিক উভয়ই—সর্বোত্তম বর্ণনা দিয়েছেন হ্যার বল্ট্, একখানা চটি বইয়ে। ট্রেভার তাঁর উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। অমূল্য চটি বইখানার অনুবাদ নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু সেটি আমার চোখে পড়েনি—আমি উপকৃত হয়েছি বলে পাঠককে পড়তে বলছি। শুনেছি, বইখানা নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় আইখমানের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, এবং ক্রোধোন্মত্ত আইখমান নাকি মার্জিনে লিখেছেন—'ব্যাটাকে যদি একবার পেতুম'![৩]

পূর্বোল্লিখিত আক্রমণের যে আদেশ হিটলার তাঁর জন্মদিনের পরের দিন, ২১

---

২ উইনি, উইনস্টন চার্চিল।

৩ বল্ট—ডি লেৎস্তেন টাগে ড্যার রাইখস্কান্ৎসেলাই।

এপ্রিল দিলেন তার সেনাপতি নিযুক্ত হলেন স্টাইনার।

পরের দিন সকালবেলা (হিটলার শুতে যেতেন ভোরের দিকে আর উঠতেন দুপুরের দিকে—শেষের দিকে দুর্ভাবনা আর ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন শুতে যেতেন আরো দেরিতে, উঠতেনও তাড়াতাড়ি, তিন ঘণ্টারও বেশী ঘুম হত না) থেকে হিটলার স্বয়ং এবং তাঁর হুকুমে অন্যান্যরা চতুর্দিকে ফোন করতে লাগলেন, স্টাইনারের আক্রমণ কতদূর এগিয়েছে ? কেউই কোনো পাকা খবর দিতে পারে না। যেটুকু আসছে তাও পরস্পরবিরোধী ; একবার স্বয়ং হিমলার বললেন—তিনি অবশ্য অকুস্থল থেকে দূরে—আক্রমণ চলছে ; তার পরমুহূর্তেই অন্য সূত্র থেকে খবর এল আক্রমণ আদপেই আরম্ভ হয়নি। এমন কি স্টাইনার স্বয়ং যে কোথায় তাও কেউ সঠিক বলতে পারে না। যে জেনারেল কলারের মুণ্ডুর ভিতর দিয়ে গরম বুলেট চালিয়ে দেবার ভয় দেখানো হয়েছিল তিনি তাঁর রোজনামচায় সেই ধুন্ধুমারের বর্ণনা লিখেছেন—এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিকেল তিনটে পর্যন্ত কোন খবর নেই। তারপর নিত্যিকার প্রথামত মন্ত্রণা-সভা বসল। উপস্থিত ছিলেন ফ্যুরার, দুই জেনারেল কাইটেল (হিটলারের পরেই তিনি) ও তার পরের জন ইয়োডল ; এবং আরো দুই সেনাপতি বুর্গডফ (পাঁড়মাতাল) ও ক্রেব্‌স্—শেষের দুজন সদাসর্বদা হিটলারের পাশের বুঙ্কারে বাস করতেন ও বলতে গেলে হিটলারের লিয়েজোঁ আপিসার ছিলেন এবং হিটলারের সেক্রেটারি বরমান।[৪]

সেই ঐতিহাসিক মন্ত্রণাসভায় হিটলার-রাইখের শেষ হাঁড়ি ফাটলো।

স্টাইনার আক্রমণ আদৌ ঘটেনি। একখানি বোমারু বা জঙ্গীবিমানও আকাশে ওঠেনি। হিটলারের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যান, মুণ্ডু দিয়ে বুলেট চালানোর বিভীষিকা প্রদর্শন—সব ভণ্ডুল, সব নস্যাৎ।

তাঁর জীবনে এই প্রথমবারের মত হিটলার পরাজয় স্বীকার করলেন।

৩ বল্‌ট্—পূর্বোক্ত।

৪ ডাঙর ডাঙর নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষ ন্যুরন্‌বের্গে 'মকদ্দমা' করেন। কাইটেল, ইয়োডলের ফাঁসি হয়। বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌সের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি ; তবে প্রায় সবাই নিঃসন্দেহ, রাশানরা যখন ২ মে তারিখে বুঙ্কার আক্রমণ করে তখন এঁরা আত্মহত্যা করেন। তার পূর্বে ক্রেব্‌স্ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে (১ মে) রাশান প্রধান সেনাপতির কাছে যান, কিন্তু রাশানরা শর্ত মানলো না বলে প্রস্তাব ভেস্তে যায়। বরমান নিখোঁজ।

হিটলারের মেজাজটি ছিল আগুনে গড়া। দুঃসংবাদ পেলেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন কর্কশ কণ্ঠে, চিৎকারে চিৎকারে তাঁর গলা ফেটে যেত, পাইচারি না—ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সবেগে ছুটোছুটি আরম্ভ করতেন, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে আরম্ভ করত, এবং চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইত। প্রধান প্রধান সেনাপতিদের মুখের সামনে ঘুষি বাগিয়ে 'কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক' পর্যন্ত বলতে কসুর করতেন না। বেদরদীরা বলে, তিনি শেষ পর্যন্ত মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কার্পেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাই তারা তাঁর নামকরণ করে 'কার্পেটভুক'। তবে সত্যের খাতিরে বলা ভাল, হিটলারের শত্রু-মিত্র কোনো ঐতিহাসিকই এটা বিশ্বাস করেননি।

এবারে শুধু যে তাই হল তা নয়, এবারে চিৎকার, হুঙ্কার, বেপথুর পর তিনি নির্জীবের মত চেয়ারে বসে স্বীকার করলেন, এই শেষ। রুশের তুলনায় জর্মন জাতি হীনবল, নির্বীয, অপদার্থ বলে সপ্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মত লোককে তাদের ফুরারররূপে পাবার গৌরব ও সামর্থ্য তারা ধরে না। তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধা নেই, তিনি দক্ষিণ জর্মনি গিয়ে আল্প্‌সের গিরি-উপত্যকা গুহা-গহ্বরে যুদ্ধ চালাবেন না—তৃতীয় রাষ্ট্র বন্ধ্যা সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তিনি বার্লিনেই থাকবেন। সম্মুখযুদ্ধ করার মত শারীরিক শক্তি তাঁর আর নেই বলে রুশরা বার্লিন প্রবেশ করলে তিনি বার্লিনের রাস্তায় বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারবেন না। তিনি তখন আত্মহত্যা করবেন।

একথা সত্য, হিটলারের শরীরে তখন আর কিছু নেই।

হিটলারের অন্যতম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হাসেলবাখ বলেন, '১৯৪০ পর্যন্ত হিটলারকে তাঁর বয়সের তুলনায় (তখন তিনি ৫০) অনেক কম দেখাত। ঐ সময় থেকে তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বুড়োতে লাগলেন। ১৯৪০ থেকে '৪৩ পর্যন্ত তাঁর যা সত্যকার বয়স তাই দেখাতো। ১৯৪৩-এর (স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের) পর তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন।' শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য যে একেবারে ভেঙে পড়ে তার জন্য অংশত তাঁর হাতুড়ে ডাক্তার মরেলই দায়ী—হিটলারকে যে সব গণ্যমান্য চিকিৎসক পরীক্ষা করেছেন, কিংবা সাময়িকভাবে চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে এ সত্যটি বলে গেছেন। হিটলার কার্যক্ষম থাকবার জন্যে—সামান্যতম সর্দিকাশিতে পর্যন্ত তিনি ভয় পেতেন, এবং আসার লক্ষণ দেখতে পেলেই অবিচারে ইনজেকশন নিতেন—মরেলের কাছ থেকে উত্তেজনাদায়ক ওষুধ চাইতেন। মরেলও অবিচারে এমন সব ওষুধ আর ইনজেকশন দিতেন যেগুলো দিত সাময়িক উত্তেজনা কিন্তু আখেরে করত স্বাস্থ্যের অশেষ ক্ষতি। বৃদ্ধ

সাময়িকভাবে থাকাকালীন অন্য এক ডাক্তার দৈবযোগে হিটলারের চাকর লিঙের ড্রয়ারে এসব ওষুধ প্রচুর পরিমাণে পান ও বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওগুলোতে মারাত্মক বিষ রয়েছে, যেগুলো অতি অল্প ডোজে কঠিন ব্যামোতে দেওয়া হয়। অথচ মরেল ওগুলো লিঙেকে দিয়ে রেখেছিলেন, হুজুর যাতে যখন খুশী, যত খুশী ঐসব ট্যাবলেট খেতে পারেন।[৫]

আর ইনজেকশনের তো কথাই নেই : লেকচার দিতে হলে পূর্বে ইনজেকশন, পরে ইনজেকশন। প্রকৃতি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে ; মরেল বা হিটলার সে সাহায্য নিতে চাইতেন না। ফলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও শেষ বয়সে নির্মমভাবে তার প্রাপ্য নেয়।

ডাক্তাররা যখন হিটলারকে এ তথ্যটি বললেন, তখন তিনি রেগে টং। মরেলের উপর না, ডাক্তারদের উপর।

হিটলার তাদের অকথ্য অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, মরেলের কড়ে আঙুলে যত এলেম, এঁদের গুষ্টির সব ক'টার মগজেও তা নেই।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে বল্‌ট্‌ মিলিটারি রিপোর্ট দিতে গিয়ে তাঁকে জীবনের প্রথমবারের মত কাছের থেকে দেখেন। 'হিটলার অনেকখানি কুঁজো হয়ে, বাঁ পা হেঁচড়ে টেনে আনতে আনতে আমার দিকে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মর্দনের সময় নির্জীব হাত কোনো চাপ দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন—তাঁর চোখে এক অবর্ণনীয় কাঁপা-কাঁপা জ্যোতি[৬] সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক এবং ভীতিজনক। তাঁর বাঁ হাত নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। তাঁর মাথাও অল্প অল্প দুলছে। তাঁর মুখ ও বিশেষ করে চোখের চতুর্দিকে দেখলে মনে হয় যেন এগুলোর সব শেষ হয়ে গেছে। সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে হয়, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ।'[৭]...অন্যরা বলেছেন, নানা রকমের বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে খেয়ে তাঁর চামড়ার রঙ বিবর্ণ পাঁশুটে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাঁ-হাত এত বেশী কাঁপতো যে চেয়ারের হাতা বা টেবিল তিনি সে হাত দিয়ে

---

৫ চিকিৎসকদের কৌতূহল হতে পারে ওষুধটা কি? এর নাম Dr. Koester's Antigaspills. এর প্রেসক্রিপশন : Extr. Nux. Vom ; tr. Bellad. a. a. 0. 5 ; extr. Gent 1. 0. বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি যদ্দৃষ্টং নকল দিলুম।

৬ অনেকে সন্দেহ করেছেন, এই জ্যোতি উত্তেজক ওষুধবশতঃ। বল্‌ট্‌, ট্রেভার রোপার, আসমান দ্রষ্টব্য।

চেপে ধরতেন ; দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত পিছনে নিয়ে গিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে রাখতেন।...বল্ট্ হিটলারের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে আবার তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি আরো কুঁজো হয়ে গিয়েছেন, আরো পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগোন। সমস্ত চেহারাটা মৃত। সবসুদ্ধ শীর্ণ-জীর্ণ বিকৃত-মস্তিষ্ক অতি বৃদ্ধের মূর্তি। চোখেও সেই অস্বাভাবিক জ্যোতি আর নেই।

হিটলার যখন দৃঢ়কণ্ঠে বার্লিনেই মৃত্যুবরণের শপথ গ্রহণ করলেন তখন সকলেই একবাক্যে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'নিরাশ হবার মত কিছুই নেই। দক্ষিণ জর্মনি ও উত্তর ইতালিতে, বোহেমিয়া অঞ্চলে ও অন্যত্র এখনো অনেক অক্ষত সৈন্যবাহিনী রয়েছে। হিটলার যদি দক্ষিণ জর্মনির গিরি-উপত্যকায় তাদের জড়ো করেন তবে আরো অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে।'

হিটলার অচল অটল। তাঁর হুকুমে পরের দিন বার্লিন বেতার প্রচার করলো, হিটলার ও গ্যোবেল্স্ ও পার্টির কর্মকর্তাগণ বার্লিন ত্যাগ করবেন না, ফ্যুরার স্বয়ং বার্লিন রক্ষা করবেন। তার পরের কথাগুলো বোধহয় গ্যোবেল্সের জোড়া প্রপাগাণ্ডা-বাণী 'বার্লিন ও প্রাগ চিরকাল জর্মন শহর হয়ে রইবে।' কাইটেল, ইয়োডল বরমানকে ডেকে বললেন, 'আমি বার্লিন ত্যাগ করবো না।' জেনারেলদ্বয় প্রতিবাদ করে বললেন, 'তাহলে দক্ষিণ জর্মনির জমায়েত সৈন্যচালনা করবে কে?' হিটলার বললেন, 'সৈন্যচালনার কীই বা আছে, লড়াইয়ের কীই বা বাকি? এখন সন্ধিসুলেহ করো গে। সে কাজ গ্যোরিঙই আমার চেয়ে ঢের ভালো পারবে।'

গ্যোরিঙের এই উল্লেখ পরবর্তী অনেক ঘটনার জন্য দায়ী।

২৩ এপ্রিল দুপুরবেলা দক্ষিণ জর্মনিতে গ্যোরিঙের কাছে এই কথোপকথনের খবর পৌঁছল। তিনি যে খুশী হলেন সেটা কারো বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু সাবধানের মার নেই বলে হিটলারের আইন-উপদেষ্টাকে ডেকে পাঠিয়ে ১৯৪১ সালের হিটলার-দত্ত সেই পুরনো প্রত্যাদেশের দলিল বের করলেন—যেটাতে হিটলার তাঁকে তাঁর ডেপুটি রূপে নিয়োগ করেছিলেন। এখন যদি রিপোর্ট সত্য হয় যে হিটলার আর কোনো হুকুম দিচ্ছেন না, এবং সন্ধিসুলেহ করার জন্য তাঁকেই স্মরণ করে থাকেন তবে তাঁকে কিছু একটা করতে হয়। পারিষদদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করার পর তিনি হিটলারকে তার পাঠালেন, আপনি যখন বার্লিনে শেষ পর্যন্ত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—তবে কি আপনি ১৯৪১ এর প্রত্যাদেশ মোতাবেক রাজী আছেন যে আমি তাবৎ রাইষের নেতৃত্ব গ্রহণ

করি ? আজ রাত্রে দশটার ভিতর কোনো উত্তর না পেলে বুঝবো, আপন কর্ম স্বাধীনতা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়েছেন এবং তদনুযায়ী দেশের দশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করবো। আপনি জানেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বময় এই মুহূর্তে আপনার জন্য আমার হৃদয়ে কী অনুভূতি হচ্ছে! ভগবান আপনাকে—' ইত্যাদি ইত্যাদি (তারপর আশীর্বচন, মঙ্গল কামনা, অন্যান্য দরদী বাৎ)।

অত্যন্ত আইনসঙ্গত সহৃদয় চিঠি। কিন্তু গ্যোরিঙের জাতশত্রু জানেন দুশমন সেক্রেটারি বরমান বছরের পর বছর ধরে এই মহাশুভ লগনের জন্য প্রহর গুনছিলেন। দিনভর হিটলার শুধু 'নেমকহারাম, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক সব—দলকে দল' এই সব বুলি আওড়েছেন ; যখন তিনি উত্তেজনার চরমে হাঁপাচ্ছেন তখন বরমান গুড়িগুড়ি টেলিগ্রামখানা এগিয়ে দেবার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে এটাও যে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা, হিটলার উৎকট সঙ্কটে অসহায় জেনে এ শুধু গ্যোরিঙের নিছক শক্তি কেড়ে নেওয়ার নীচ হীন ষড়যন্ত্র এবং এটা তারই নির্লজ্জ আলটিমেটাম (ভীতিপ্রদর্শনের সঙ্গে ম্যাদ)—এ কথাটিও বললেন।

হিটলার তখন চতুর্দিকে দেখছেন বিশ্বাসঘাতকতা ; এটা তারই আরেক নেমকহারাম নিদর্শন—এই অর্থেই সেটা গ্রহণ করলেন। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে গ্যোরিঙকে দিলেন অশ্রাব্য গালাগাল। বেবাক ভুলে গেলেন, তাঁরই মুখে বেরিয়েছিল গ্যোরিঙ সম্বন্ধে প্রস্তাব, কিন্তু বরমান যখন গ্যোরিঙের প্রাণদণ্ডাদেশ চাইলেন তখন তিনি পার্টি এবং ফ্যুরারের প্রতি গ্যোরিঙের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সেবা ভুলতে না পেরে আদেশ দিলেন, তাঁকে তাঁর সর্ব পদ সর্ব ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করা হল, এবং আদেশ দেওয়া হল হিটলারের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন না। এবং তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখার হুকুম দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে হিটলার গ্যোবেল্‌স্ দম্পতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তাঁরা যেন তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে তাঁদের ছ'টি বাচ্চাসহ তাঁর পাশের বুঙ্কারে বাসা বাঁধেন। সুবুদ্ধিমান হাতুড়ে ডাক্তার মরেল ইতিপূর্বেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে (কেউ কেউ বলেন চোখের জল ফেলে অনুনয় করে, অন্যেরা বলেন কুমীরের ভণ্ডাশ্রু) হিটলারের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করে দূর দক্ষিণে কেটে পড়েছেন (হিটলার যেন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'যে পথে যাচ্ছি সেখানে যাবার জন্যে আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নেই')। তাঁর কামরা ছিল বুঙ্কারে হিটলারের মুখোমুখি—গ্যোবেল্‌স্ সে ঘরটাও পেলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। গ্যোবেল্‌স্ বললেন তিনিও

আত্মহত্যা করবেন, এবং হিটলারের আপত্তি সত্ত্বেও ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ বললেন, তিনিও সেই পথ ধরবেন এবং বাচ্চা ছ'টিকে বিষ খাইয়ে মারবেন।

এটা এমনি বীভৎস কাণ্ড যে কোনো ঐতিহাসিকই এ নিয়ে মন্তব্য করেননি। এর পর হিটলার তাঁর কাগজপত্র থেকে নিজে বাছাই করে কতকগুলো পোড়াবার আদেশ দিলেন।

সমস্ত দিন ধরে দক্ষিণ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ, উত্তর থেকে নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস ও হিমলার এবং আরো একাধিক আর্মীর হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, কিন্তু হিটলার অটল অচল। ২৩ তারিখে তিনি জেনারেল কাইটেলকে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন জেনারেল ভেংকের কাছে—তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিন উদ্ধার করবেন। ইতিমধ্যে রাশানরা বার্লিন মাঝখানে রেখে সাঁড়াশী ব্যূহ নির্মাণের জন্য বার্লিন ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গিয়েছে। ভেংককে এদের সঙ্গে লড়াই করে করে তবে বার্লিন পৌঁছতে হবে। হিটলার ঘড়ি ঘড়ি শুধোচ্ছেন, ভেংকের খবর কি, তিনি কতদূর এগিয়েছেন! সমস্ত বুঙ্কারবাসীর ঐ এক শেষ ভরসা। কিন্তু তাঁর কোনো খবর নেই।

২৫ তারিখে রুশসৈন্য সমস্ত বার্লিন চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলল। এর পর আর দশ-বিশজন লোক যে একসঙ্গে বার্লিন থেকে বেরুবে তার উপায় আর রইল না। তবে একজন দুজন গলিঘুঁচি দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাতের অন্ধকারে হয়তো বেরুতে পারে। এ অবস্থায় হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার জন্য আর অনুরোধ করা যায় না।

কিন্তু বুঙ্কারে দিনে দু'বার কখনো বা তিনবার হিটলার তাঁর মন্ত্রণাসভায় নেতৃত্ব করে যেতে লাগলেন। সেখানে শুধু ঐ খবরই পাওয়া যেত, রুশরা বার্লিনের কোন্‌ দিকে কতখানি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বৃদ্ধ আর বারো থেকে ষোল বছরের ছেলেরা যতখানি পারে লড়াই দিচ্ছে। যে কোনো সেনানীর পক্ষেই কোনো শহরের অন্তর্ভাগ দখল করা সহজ নয়। রুশরা এগুচ্ছে ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে। ইতিমধ্যে পূর্ব থেকে এসে রুশসৈন্য ও পশ্চিম থেকে এসে মার্কিন সৈন্য মধ্য-জর্মনিতে হাত মিলিয়েছে—জর্মনি এখন দুখণ্ডে বিভক্ত। উত্তর থেকে—বার্লিন থেকে এখন আর আলপ্‌সের গিরি-উপত্যকায় গিয়ে যুদ্ধ প্রলম্বিত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই সেনাবাহিনীর এই হাত মেলানোর খবর হিটলার পেলেন মন্ত্রণাসভায় বসে। সংবাদদাতা বললেন, 'দুদলে কথা-কাটাকাটি হয়েছে।' ফ্যুরারের

পাংশু মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চোখের জ্যোতি যেন হঠাৎ ফিরে এল। সোল্লাসে বললেন, 'আমি কি তখনই বলিনি? এইবারে শুরু হবে।' কিন্তু হায়, পরের দিনই খবর এল, দু'দল শান্তভাবে আপন আপন থানা গেড়ে নির্বিরোধে খবর পরামর্শ লেন-দেন করছে।

বার্লিনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অষ্টপ্রহর উপর থেকে বোমাবর্ষণ এবং তার সঙ্গে এসে জুটেছে শহরের উপকণ্ঠে বিরাট বিরাট কামান। বোমা ফেলছে বুঙ্কারের উপর। স্তালিনগ্রাদে যে সব জর্মন ধরা পড়েছিল তাদের অনেকে মিলে হিটলার-বিরোধী এক 'স্বাধীন-জর্মনি' দল গড়ে। এরাই আজ রুশদের বার্লিনের রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে। তাই তাগেও ভুল হচ্ছে না। বুঙ্কারে ফাটল ধরেছে। শহরের কোনো জায়গায় যদি অগ্নিপ্রজ্বালক বোমায় আগুন ধরলো তবে সে আগুন জলের অভাবে নেভানো যায় না বলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ না পূর্বের থেকে পুড়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছয় ততক্ষণ সে ব্লকের পর ব্লক, রাস্তার পর রাস্তা পুড়িয়ে চলে। ভূগর্ভস্থ সেলারে সেলারে লক্ষ লক্ষ আহত সৈনিক গোঙরাচ্ছে, শিশুরা কাঁদছে। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোমা পড়ে কোনো কোনো জায়গায় জলের পাইপ ফেটে পূর্বে যে জল জমেছিল মেয়েরা সেই ঘোলাটে জল বালতিতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

খবর এল রাস্তায় রাস্তায় লড়ে লড়ে রুশসৈন্যরা তো এগুচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভূগর্ভস্থ রেলপথের (আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে) টানেল দিয়ে এগিয়ে আসছে। হিটলার হুকুম দিলেন স্প্রে নদীর (কানাল বা বড় খালও বলা হয়) জল বন্ধ করার গেট খুলে দিতে। সে জল রুশদের ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মরবে হাজার হাজার আহত জর্মন সৈনিক—যারা মাটির নিচের স্টেশন-প্লাটফর্মে শুয়ে শুয়ে অচিকিৎসায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এদের জীবন-মরণে হিটলারের ভ্রূক্ষেপ নেই। বল্‌ট্‌ বলেছেন, সমস্ত যুদ্ধে এ রকম হৃদয়হীন আদেশ তিনি শোনেননি। (এ আদেশ পালিত হয়েছিল কি না আমি জানি নে)।

এর চেয়েও নিষ্ঠুর আদেশ হিটলার বরমানকে পূর্বেই দিয়ে বসে আছেন। যে শহরের সামনে শত্রুসৈন্য দেখা দেবে তার তাবৎ কারখানা, ওয়াটার-ওয়ার্কস, বিজলি, নদীর উপর সেতু সব যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সরবরাহ মন্ত্রী স্পের আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'যুদ্ধের পরে জর্মনরা তবে গড়বে কি, বাঁচবে কি দিয়ে?' হিটলার বললেন, 'এ যুদ্ধে সপ্রমাণ হয়েছে জর্মন জাত রুশের তুলনায় অপদার্থ; এদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।' স্পের কিন্তু গোপনে এ-আদেশ বানচাল করে দেন।

নিষ্ঠুরতম আদেশ দেন হিটলার বরমানকে জর্মন জাতকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে আবালবৃদ্ধ নরনারীকে খেদিয়ে, সঙ্গীনের ঘায়ে, গুলি চালিয়ে জড়ো করা হোক মধ্য-জর্মনির এক মধ্য-অঞ্চলে। পথে বা সেখানে আহারাদির কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। সেখানে ও পথে আসতে আসতে তারা সবাই মরবে। এ-আদেশ পালিত হয়নি। সেনাবাহিনীতে হুকুম দেবার মত যথেষ্ট অফিসার ছিলেন না বলে, না অন্য কারণে কেউ স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখ করেননি। তবে একাধিক ঐতিহাসিক বলেছেন, বাইবেল-বর্ণিত স্যামসন ('স্যামসন ও ড্যালাইলা' ছবি এদেশেও আসে) যে রকম মৃত্যুবরণ করার সময় তাঁর শত্রুদের মন্দির টেনে ভেঙে ফেলে তাদেরও মৃত্যু ঘটান, হিটলারও তেমনি ওপারে যাবার সময় কুল্লে জাতটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বার্লিনবাসীরা প্যারিজিয়ানদের মত কখনো নিজেদের মধ্যে সিভিল ওয়ার লড়েনি বলে কখনো রাস্তায় রাস্তায় পিপে, পাথর, আসবাবপত্র, ভাঙা গাড়ি, মোটর দিয়ে ঘাঁটি বা ব্যারিকেড বানাতে শেখেনি। যেগুলো বানিয়েছিল সেগুলো এতই আনাড়ি হাতে তৈরি কাঁচা যে তার বর্ণনা দিয়েছেন সুইডেন রাজ-পরিবারের কাউন্ট ফলকে বেরনাডট্টে। ইনি ব্যারিকেড বানাবার সময় বার্লিনে আসেন সুইডিশ রেড্ ক্রসের প্রতিভূ হিসাবে, তাঁর দেশবাসী বন্দীদের জন্য মুক্তির আবেদন করতে।[৮] ঐ ব্যারিকেডগুলো নিয়ে খাস বার্লিন কর্কনিরা (ঢাকার কুট্টিদের মত) একে অন্যের সঙ্গে মন্তব্য বিনিময় করছিল। একজন বললে, 'এগুলো ভাঙতে রুশদের এক ঘণ্টা দু' মিনিট লাগবে।' 'কি রকম?' 'পাকা একঘণ্টা তাদের লাগবে হাসি থামাতে। আর দু' মিনিট লাগবে সেগুলো ভাঙতে।'

ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারে প্রায় ছ-সাতশ' হিটলার-দেহরক্ষী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বেঞ্চিতে মাটিতে ঘুমিয়ে অথবা সংখ্যাতীত টিনে রক্ষিত হ্যাম, বেকন, সসেজ ('রুটির উপর এত পুরু মাখন যে বলদ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাবে') মুর্গী-

৮ ঐ সময়েই হিমলার প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তাঁরই মাধ্যমে মিত্র-পক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। এসব আলোচনা ও জর্মন রাষ্ট্রের শেষ ক' মাস সম্বন্ধে তিনি যুদ্ধের পর একখানি মনোরম বই লেখেন—ইংরিজি অনুবাদের নাম The curtaln falls. পরম পরিতাপের বিষয় এই সহৃদয়, বিশ্বনাগরিক কয়েক বৎসর পর প্যালেস্টাইনে ইহুদী আরবের সমঝাওতা করতে গেলে সেখানে ইহুদী আততায়ীর গুলিতে মারা যান।

রোস্ট আর বোতল বোতল ফ্রান্স থেকে লুট-করে-আনা, জর্মনির আপন উৎকৃষ্ট ওয়াইন, শ্যাম্পেন খাচ্ছে। এরা জর্মনির ঐতিহ্যগত সেনাবাহিনীর লোক নয়—তারা লড়ছে আপ্রাণ—এরা হিটলার হিমলারের আপন হাতে তৈরী এস এস, যুদ্ধে নামবার বিশেষ আগ্রহ এদের নেই। এদের দেখে বল্‌ট্‌ মনে মনে ভাবছেন, 'এরা এখানে কেন? ফ্যুরার তথা জর্মনির শত্রু বুঙ্কারের ভিতরে না বাইরে, যেখানে লড়াই হচ্ছে?' কিন্তু রান্নাঘরের খাস বার্লিনের কক্‌নি (কুট্টি) মেয়েরা স্পষ্টভাষী। হঠাৎ কয়েকজন চিৎকার করে এদের বললে, 'হেই, হতভাগা নিষ্কর্মার দল! তোরা যদি এখখুনি বাইরে গিয়ে যুদ্ধে না নামিস তবে তোদের পরিয়ে দেব আমাদের গা থেকে মেয়েছেলেদের রান্নার সময়কার পোশাক। আর আমরা যাবো লড়তে। বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেরা প্রাণ দিচ্ছে লড়তে লড়তে, রাস্তায়—আর হামদো হামদো তাগড়ারা বসে আছে এখানে!'

হিটলার তাকিয়ে আছেন ভেংকের আশায়।

বুঙ্কারের এই পাগলদের দুরাশার ভিতর একটি লোকের মাথা পরিষ্কার ছিল—ইনি হিমলারের প্রতিনিধি—ফেগেলাইন। কিন্তু তিনি জানতেন না, যেখানে সবাই পাগল সেখানে সুস্থ-মস্তিষ্ক হওয়া পাগলামি। ইনি মোকা বুঝে এফার (যাকে দু'দিন পরে হিটলার বিয়ে করেন) বোনকে বিয়ে করে যেন হিটলার-পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন—আসলে সবাই একমত, লোকটা অপদার্থ। গোড়াতে ছিল রেস্‌-কোর্সের জকি। আঙুল ফুলে কলাগাছ, দম্ভভরে যাকে-তাকে অপমান করতো—ওদিকে বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌স্‌ তার এক গেলাসের ইয়ার। হিটলার-পরিবারের সম্মানিত সদস্য হয়েও পারিবারিক আত্মহত্যা করে পারিবারিক চিতানলে হিটলার-এফার সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে বৃহত্তর গৌরব সে কামনা করেনি।' সোনা-জওহর নিয়ে পালাবার সময় সে ধরা পড়লো—এই সঙ্কটের সময়ও যে হিটলার সব দিকে নজর রাখতেন সেটা সপ্রমাণ হল যখন তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন, ফেগেলাইন নেই। ধরার পর হিটলারের আদেশে তার য়ুনিফর্ম, মেডেলাদি কেড়ে নিয়ে, পদচ্যুত করে তাকে বন্দী করে রাখা হল।

২৭ এপ্রিল দিনের শেষে রাত্রে রাশানরা যেন দৈবক্ষমতায় দিব্যদৃষ্টি পেয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে হিটলারের বুঙ্কারের আশেপাশে, উপরে বোমার পর বোমা ফেলতে লাগল। বুঙ্কার-বাসীরা জড়সড় হয়ে শুনতে পাচ্ছে যেন প্রত্যেকটি কামানের বিরাট গোলা তাদেরই মাথার উপর ফাটছে। কারো মনে আর সন্দেহ রইল না, এবার যে কোনো মুহূর্তে রুশেরা সরাসরি বুঙ্কার আক্রমণ করবে।

সে রাত্রে হিটলার তাঁর অন্তরঙ্গজনকে নিয়ে মজলিসে বসলেন। স্থির হল,

প্রথম রুশসৈন্য দেখা দিতেই পাইকারি হারে সবাই আত্মহত্যা করবেন। তারপর সবাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেন, কি প্রকারে মৃতদেহগুলোও সনাক্তের বাইরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা যায়। তারপর একে একে প্রত্যেকে ছোট্ট ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে হিটলার ও জর্মনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন বলে শপথ নিলেন।

ব্লাফ্! ব্লাফ্! ব্লাফ্! সবসুদ্ধ দুই কিংবা তিনজন প্রতিজ্ঞা পালন করেন। আর সবচেয়ে হাস্যকর—হিটলারের মৃত্যুর ঘণ্টা তিনেক পরেই আমিরদের পয়লা নম্বরী বরমান চার নম্বরী ক্রেব্‌স্‌কে পাঠালেন রুশদের কাছে সন্ধি-স্থাপনার্থে। সেটা বানচাল হয়ে গেলে দু'জন ছাড়া সবাই চেষ্টা করলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে, বরমান একটা ট্যাঙ্কে চড়ে—এটার ব্যবস্থা তিনি শপথ নেবার পূর্বেই করেছিলেন নিশ্চয়—রুশ-ব্যূহ এড়িয়ে, তখনো অপরাজিত উত্তর জর্মনিতে ডোনিৎসের (হিটলার মৃত্যুর পূর্বে একেই রাষ্ট্রের প্রধান রূপে নির্বাচিত করে যান) সঙ্গে যোগ দিতে। যাঁরা অক্ষম হয়ে মার্কিনদের হাতে বন্দী হলেন তাঁরা তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করলেন মার্কিনদের সুমুখে, কে হিটলারকে কত বেশী ঘৃণা করতেন সেইটে সাড়ম্বরে বোঝাতে।

হিটলার তখনো আশা ছাড়েননি। কখনো সামনে ম্যাপ খুলে কম্পিত হস্তে রুশসৈন্য, ভেংকের সৈন্য, নবম বাহিনীর সৈন্য রঙিন বোতাম দিয়ে প্রতীক করে যুদ্ধের ব্যূহ নির্মাণ করছেন আক্রমণের পথ স্থির করছেন; কখনো বা চিৎকার করে মিলিটারী হুকুম দিচ্ছেন—যেন তিনি নিজে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছেন। কখনো ঘর্মাক্ত হস্তে ম্যাপ নিয়ে দ্রুতপদে পাইচারি করছেন—ভেজা হাতের স্পর্শে ম্যাপখানা দ্রুত পচে যাচ্ছে—আর যাকে পান তাকেই সেই ম্যাপ দেখান, কি ভাবে, কোন্ পথে, সমরনীতির কোন কূটচালে শত্রুপক্ষকে নির্মম ঘায়েল করে, যেন এক অলৌকিক বিস্ময়ে ভেংক এসে সবাইকে এই সংকট থেকে মুক্ত স্বাধীন করবেন।

এঁদের অনেকেই ততদিনে জেনে গিয়েছেন, ভেংকের সেনাবাহিনী বলে আর কিছু নেই। যে ক'জন তখনো বেঁচে ছিল তাঁদের তিনি অনুমতি দিয়েছেন, পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে মার্কিনদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে—রুশদের চেয়ে মার্কিনরাই ভালো, এই তখন আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ভেংকের সত্য বিবরণ হিটলারকে বলে কে? বলে লাভ? কাইটেল, ইয়োডল সব জেনে শুনে হিটলারের আর্তনাদী টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রামের কোনো উত্তর দিচ্ছেন না—(নামে মাত্র) আর্মি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। কী উত্তর দেবেন এঁরা?

লিঙে এ সময়ে হিটলারের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুতগতিতে পাইচারি করছেন, কখনো বা ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বদ্ধমুষ্টি দিয়ে দেয়ালে করাঘাত করছেন।' কেন? তাঁর কাছে ঘরের চারখানা দেয়াল কি কারাগারের চারখানা প্রাচীরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে?

আর পাইচারি? এটা তাঁর প্রাচীন দিনের অভ্যাস। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন? দিনের পর দিন। হিটলারের একমাত্র বন্ধু ফোটোগ্রফার হফ্‌মান লিখেছেন, 'হিটলারের প্রথমা প্রেয়সী (সকলেরই মতে এইটেই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ-গ্রেট্ লাভ—এফার প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অন্য ধরনের) যখন আত্মহত্যা করে মারা যান, তখন তিনি নিচের তলা থেকে হিটলারের পদধ্বনি শুনতে পান তিন দিন তিন রাত ধরে—মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে। এই তিন দিন তিন রাত তিনি জলস্পর্শ করেননি। প্রণয়িনীর গোর হয়ে গিয়েছে খবর পেয়ে হিটলার পাইচারি বন্ধ করে সোজা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গিয়ে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'[৯]

আর কখনো কখনো টেবিলের উপর কনুই রেখে অনেকক্ষণ ধরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সমুখপানে।

ভেংকের জন্য প্রতীক্ষা, তাঁর উত্তেজনা ও জালবদ্ধ পশুর মত ছটফটানি তার চরমে পৌঁছল ২৮ এপ্রিল। রাশানরা তখন বার্লিন নগরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে লড়াই করে করে হিটলারের বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসছে। বার্লিনের কমাণ্ডাণ্ট হিটলারকে বলে গেছেন, দু দিন, জোর তিন দিনের ভিতর রুশরা বুঙ্কারে এসে পৌঁছবে। কিন্তু ভেংক কোথায়? কি ঘটে থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই আবার বিশ্বাসঘাতকতা! বার্লিন জয় করার মত শক্তির শতাংশের একাংশও যে ভেংকের নেই সে-কথা কে বিশ্বাস করে? ২৮শে সন্ধ্যায় বরমান সেই সুদূর দক্ষিণ জর্মনির ম্যুনিকে তাঁর মিত্র এডমিরাল পুট্‌কামারকে টেলিগ্রাম করলেন, 'সৈন্যদের আদেশ ও অনুরোধ করে যে সব কর্তৃপক্ষ তাদের এখানে আমাদের উদ্ধার করার জন্য পাঠাতে পারতেন, তাঁরা সেটা না করে নীরব। বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বস্ততার স্থান অধিকার করেছে। আমরা এখানেই থাকবো। ফ্যুরার-ভবন খণ্ড-বিখণ্ড।'

এক ঘণ্টা পর, বহু প্রতীক্ষার পর বাইরের জগৎ থেকে পাকা খবর এল। হিটলারকে কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে হাইনরিষ হিমলার—গ্যোরিঙের পদচ্যুতির

৯ হাইনরিষ হফ্‌মান, হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড

পর এখন যিনি জর্মনির দ্বিতীয় ব্যক্তি—মিত্রশক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছেন, পূর্বোল্লিখিত রেড্‌ক্রশের নেতা সুইড্‌ কাউণ্ট বের্নাডট্টের মাধ্যমে। প্রস্তাবটি গোপনেই করা হয়েছিল কিন্তু কি করে কে জানে সেটা গুপ্তপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন এক বেতার-কেন্দ্র সেটা প্রচার করেছে। হিটলারের বার্তা সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী বেতারে সেটা শুনে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে স্বয়ং এসেছেন হিটলারকে মুখোমুখি খবরটা দিতে।

কামানের গোলা, বোমারুর বোমা তখন ডাল-ভাত। কাজেই ঘরের ভিতর বোমা ফাটলেও হিটলার অতখানি বিচলিত হতেন না। 'সেই বিশ্বাসী হাইনরিষ, যে কি না তার খাস সৈন্যদলের বেল্টে খোদাবার আদেশ দিয়েছিল—TREUE—বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি, নেমকহালালী!—সে কুকুর এখন ঠাকুরের আসনে বসতে চায়, তাঁর প্রতি নেমকহারামী করে?' এই একমাত্র নাৎসি নেতা যাঁর প্রভুতে অবিচল ভক্তি সম্বন্ধে কারো মনে কখনো সন্দেহ হয়নি। আর এ-কথা সকলেই জানতেন, যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনই হিটলার মার্শাল ল প্রচার করেছিলেন, 'তাঁর কোনো কর্মচারী—তা তিনি যত উচ্চপদেরই হোন না কেন—যদি কোনো সন্ধির আলোচনা করেন তবে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে—এ বাবদে কোনো করুণা দেখানো হবে না।'

হিটলারের মুখ থেকে নাকি সবশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছিল।

স্টাইনারের আক্রমণ কেন হয়ে ওঠেনি, ভেংক কেন আসছে না—এসব সমস্যা হিটলারের কাছে সরল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই পিছনে রয়েছে হিমলারের বিশ্বাস-ঘাতকতা। অবশ্য ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন এ সন্দেহ সত্য নয়। হিমলার শেষ মুহূর্তে সন্ধির প্রস্তাব এনে শুধু আপন প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন—অন্য বহু বহু নাৎসি নেতার মত। তাঁরা গোপনে সুইস ও দক্ষিণ আমেরিকার জর্মন-বহুল নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাধিক রাষ্ট্রে বিস্তর অর্থ জমা রেখেছিলেন ও জাল নামে পাশপোর্টও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। হিমলারকে জনসাধারণ ভালো করেই চিনতো; তাঁর পক্ষে এ পন্থা সম্ভবপর ছিল না।[১০]

---

১০ আখেরে তিনি সেই চেষ্টাই করেছিলেন। ছদ্মবেশে মিত্রশক্তির ঘাঁটি পেরবার সময় তিনি বন্দী হন। দেহতল্লাসির সময় মুখে কিছু আছে কি না দেখবার জন্য তাঁকে মুখ খুলতে বললে তখন তিনি বুঝলেন এই তাঁর শেষ সুযোগ। ডাক্তার মুখে হাত ঢোকাবার পূর্বেই তিনি দাঁত ও মাড়ির মধ্যে লুকানো ক্যাপসুলে কামড় দিলেন। আবরণ ভেঙে বিষ বেরিয়ে এল; কয়েক মিনিটের

হিমলারের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র পর হিটলারের সর্বশেষ কর্ম সম্বন্ধে মনস্থির করতে আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না। প্রথমেই হিমলারের বিশ্বাসী নায়েব, প্রতিভু, লিয়েজোঁ অফিসার ফেগেলাইনকে বন্দিশালা থেকে বের করে নিয়ে এসে সওয়াল করা হল। এই সব বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে তিনি কতখানি ওকীব-হাল ছিলেন? ফেগেলাইন কি উত্তর দিয়েছিলেন তা আর জানবার উপায় নেই। প্রশ্নকর্তারা মৃত নয় নিরুদ্দেশ। হিটলারের যুক্তি, ফেগেলাইন যদি না জানবে তবে পালাবার চেষ্টা করলো কেন? বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কি? হুকুম দিলেন, বুঙ্কারের বাইরের বাগানে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে। বল্‌ট্‌ তাঁর বইয়ে বলেছেন, 'এফা তাঁর ভগ্নিপতিকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না আমরা তার কোনো খবর পেলুম না, হয়তো স্বামীর উপর তাঁর কোনো প্রভাবই ছিল না, কিংবা হয়তো তিনি তাঁর স্বামীর মতই ধর্মান্ধের মত বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড—তা সে যে-ই হোন।' আমাদের মনে হয় দুটোই। ঐ সময় শ্রীমতী হানা রাইট্‌শ বুঙ্কারে ছিলেন। ইনি বিশ্বের অন্যতম নামজাদা পাইলট (পরবর্তীকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে এঁর হৃদ্যতা হয় এবং তাঁর অতিথি হয়ে কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন)। ইনি বলছেন, এফা নাকি ঐ সময় বেদনাভরে এক হাত দিয়ে আরেক হতে মোচড়াতে মোচড়াতে যাকে পেতেন তাকেই বলতেন, 'হায় বেচারা, বেচারা আডল্‌ফ্‌! সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, সবাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দশ হাজার লোক মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু জর্মনি যেন আডল্‌ফ্‌কে না হারায়!'

রুশরা বুঙ্কার থেকে আর মাত্র হাজার গজ দূরে।

২৮।২৯ এপ্রিলের রাত। ফেগেলাইনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হিটলার অন্যান্য কর্তব্যের দিকে মন দিলেন। যে রমণী তাঁকে ১৪।১৫ বৎসর ধরে ভালোবেসেছেন, ভালোবাসার প্রথম দিকে একবার নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাতে গুরুতর-রূপে জখম হন, হিটলার যাঁকে বিশ্বাস করতেন সব চেয়ে বেশী (হিটলারও বলতেন, তিনি দুজনকে অবিচারে বিশ্বাস করেন। এফা ও তাঁর আলসেশিয়ান ব্লণ্ডীকে), সঙ্কট ঘনিয়ে এলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হিটলার বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে রাজী হননি, এবং যিনি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিক-

ভিতরই ভবলীলা সম্বরণ করলেন। গ্যোরিঙও এই পদ্ধতিতেই জেলের ভিতর আত্মহত্যা করেন। তাঁর দেহ ও মুখ বহুবার সার্চ করা হয়, কিন্তু তিনি যে কোথায় ক্যাপসুলটি দিনের পর দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা আজও রহস্য।

জনকে একাধিকবার বলেছেন, 'আডল্‌ফ্‌ আর আমার জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা', সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যাঁকে হিটলার অল্প লোকের সামনেই বেরুতে দিতেন, কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন মোটরে যেতেন, সভাস্থলে এফা দর্শকদের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনতেন—সেই এফা এত বৎসর পর তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার এবং আসন পেলেন। সে রাত্রে হিটলার তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ডিকটেটরদের প্রিয়া, রক্ষিতা, উপপত্নী, পত্নীরা যে রকম রোমান্টিকভাবে তাঁদের বল্লভদের জীবন প্রভাবান্বিত করেন, পর্দার সামনে কিংবা আড়ালে বহুলোকের জীবনমরণ নিয়ে খেলা করেন—চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগ অনেক কিছু করে থাকেন,—এফার সেদিকে কোনোই আকর্ষণ ছিল না। কর্মব্যস্ত হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন কমই। বিশেষ করে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর তিনি ভিন্ন ভিন্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিধানে থাকতে বাধ্য হতেন বলে প্রোষিতভর্তৃকা এফা দূর আল্‌প্‌সের উপর হিটলারের নির্জন নিরানন্দ বের্গহফ ভবনে একা একা দিনের পর দিন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেন। চাকর-বাকররা বলত এ যেন 'সোনার খাঁচার বন্ধ পাখী'। তারপর হঠাৎ একদিন বল্লভ এসে উপস্থিত হতেন অতিশয় অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বাড়ি গমগম করে উঠতো। ডিনার, তারপর ফিল্ম, তারপর সঙ্গীত, রাত দুটোয় শেষ পার্টি—হিটলার টিটোটেলার, খেতেন হাল্কা চা, কাপের পর কাপ, অন্য সবাই শ্যাম্পেন। হিটলার ঘুম থেকে উঠতেন দেরিতে। খেয়ে জিরিয়ে এফা, ব্রাণ্ডী, অনুচরদের নিয়ে নির্জন পথে বেড়াতে বেরুতেন। পথের শেষপ্রান্তে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে চা, কেক্‌, ক্রীম-বান খাওয়া হত। হিটলার প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতো। প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে সবাই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান ছিল না। হিটলারের মৃত্যুর পূর্বে ১০ লক্ষের ভিতর একজনও জানতো না, হিটলারের কোনো বান্ধবী আছেন।[১১]

---

১১ এফা ব্রাউন (হিটলার) সম্বন্ধে কৌতূহলীজন সর্বোত্তম খবর পাবেন পূর্বোল্লিখিত হফ্‌মানের বইয়ে। এঁর ফোটো-ল্যাবরেটরিতেই এফা কাজ করার সময় হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হফ্‌মান তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেন। হিটলারের ভ্যালে লিঙে উভয়েরই কামরা-বিছানা সাফসুৎরো করতেন, এবং একদিন দৈবাৎ তিনি দুজনাকে এমন অবস্থায় পান যে, লিঙের চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। লিঙেই এঁদের অন্তরঙ্গতার বিস্তরতম খবর দিয়েছেন। এফাও লিঙেকে খুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁর মনের কথা খুলে বলতেন। আসন্ন

জনকে একাধিকবার বলেছেন, 'আডল্‌ফ্‌ আর আমার জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা', সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যাঁকে হিটলার অল্প লোকের সামনেই বেরুতে দিতেন, কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন মোটরে যেতেন, সভাস্থলে এফা দর্শকদের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনতেন—সেই এফা এত বৎসর পর তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার এবং আসন পেলেন। সে রাত্রে হিটলার তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ডিকটেটরদের প্রিয়া, রক্ষিতা, উপপত্নী, পত্নীরা যে রকম রোমান্টিকভাবে তাঁদের বল্লভদের জীবন প্রভাবান্বিত করেন, পর্দার সামনে কিংবা আড়ালে বহুলোকের জীবনমরণ নিয়ে খেলা করেন—চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগ অনেক কিছু করে থাকেন,—এফার সেদিকে কোনোই আকর্ষণ ছিল না। কর্মব্যস্ত হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন কমই। বিশেষ করে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর তিনি ভিন্ন ভিন্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিধানে থাকতে বাধ্য হতেন বলে প্রোষিতভর্তৃকা এফা দূর আল্‌প্‌সের উপর হিটলারের নির্জন নিরানন্দ বের্গহফ ভবনে একা একা দিনের পর দিন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেন। চাকর-বাকররা বলত এ যেন 'সোনার খাঁচার বন্ধ পাখী'। তারপর হঠাৎ একদিন বল্লভ এসে উপস্থিত হতেন অতিশয় অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বাড়ি গমগম করে উঠতো। ডিনার, তারপর ফিল্ম, তারপর সঙ্গীত, রাত দুটোয় শেষ পার্টি—হিটলার টিটোটেলার, খেতেন হাল্কা চা, কাপের পর কাপ, অন্য সবাই শ্যাম্পেন। হিটলার ঘুম থেকে উঠতেন দেরিতে। খেয়ে জিরিয়ে এফা, ব্রাণ্ডী, অনুচরদের নিয়ে নির্জন পথে বেড়াতে বেরুতেন। পথের শেষপ্রান্তে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে চা, কেক্‌, ক্রীম-বান খাওয়া হত। হিটলার প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতো। প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে সবাই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান ছিল না। হিটলারের মৃত্যুর পূর্বে ১০ লক্ষের ভিতর একজনও জানতো না, হিটলারের কোনো বান্ধবী আছেন।[১১]

---

১১ এফা ব্রাউন (হিটলার) সম্বন্ধে কৌতূহলীজন সর্বোত্তম খবর পাবেন পূর্বোল্লিখিত হফ্‌মানের বইয়ে। এঁর ফোটো-ল্যাবরেটরিতেই এফা কাজ করার সময় হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হফ্‌মান তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেন। হিটলারের ভ্যালে লিঙে উভয়েরই কামরা-বিছানা সাফসুৎরো করতেন, এবং একদিন দৈবাৎ তিনি দুজনাকে এমন অবস্থায় পান যে, লিঙের চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। লিঙেই এঁদের অন্তরঙ্গতার বিস্তরতম খবর দিয়েছেন। এফাও লিঙেকে খুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁর মনের কথা খুলে বলতেন। আসন্ন

এই দুদিনে বিয়ের রেজেস্ট্রি অফিসার যোগাড় করা সহজ হয়নি। শেষটায় একজন এলেন যাঁকে বুঙ্কারের কেউই চেনে না। গ্যোবেল্‌স্ এঁকে যোগাড় করে এনেছেন; লিঙের মতে ইনিই নাকি একদা গ্যোবেল্‌সের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এমার্জেন্সি বা বিন্‌নোটিসের বিয়ে বলে বহ্বাড়ম্বর আর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দেওয়া হল। দুই পক্ষ মৌখিক—সাধারণতঃ হিটলার-জর্মনিতে সার্টিফিকেট দরকার হত—শপথ দিলেন, উভয়েই অবিমিশ্র 'আর্যরক্ত' ধরেন, ও তাঁদের বংশগত কোনো ব্যাধি নেই। তারপর উভয়ে রেজিস্ট্রিতে সই করলেন। কনে নাম সই করার সময় 'এফা' লিখে 'ব্রাউন' লেখবার জন্যে 'বি' হরফ লিখে ফেলেছিলেন; তাঁকে ঠেকানো হলো, তিনি 'বি' কেটে 'হিটলার' ও 'ব্রাউন নামে জন্ম' (nee) লিখলেন। গ্যোবেল্‌স্ ও বরমান সাক্ষী হলেন।[১২] রাত তখন একটা বেজে গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে।

বিয়ের পর হিটলারের ঘরে পার্টি বসলো। শ্যাম্পেন এল। বহু বৎসর পূর্বে গ্যোবেল্‌স্ যখন বিয়ে করেন তখন হিটলার সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার সেই অবিমিশ্র আনন্দের দিনের সঙ্গে অদ্যকার আনন্দের উপর করাল ছায়ার তুলনা করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। জর্মন ভাষায় একটি সংহিটে আছে, 'চোখের জল নিয়ে আমি নাচছি'—এ যেন তাই। হিটলার আবার তাঁর আত্মহত্যার কথা তুললেন। বললেন, তাঁর জীবনাদর্শ (ভেল্টআনশাউউঙ) নাৎসিবাদ খতম হয়ে গেল; এর পুনর্জন্ম আর কখনো হবে না। তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তিনি এসব থেকে নিষ্কৃতির আরাম পাবেন।

পার্টি চালু রেখে তিনি পাশের ঘরে তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ফ্রাউ য়ুঙেকে নিয়ে তাঁর দুখানা উইল মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন। প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক, দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। পাঠক

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি লিঙের কাছে যে সব করুণ কথা বলেন সেগুলোও পড়ার যোগ্য।...হিটলারের চিকিৎসক মরেলও এফা সম্বন্ধে তাঁর জবানবন্দিতে কিছু কিছু বলেছেন।

১২ কয়েক মাস পূর্বে; অর্থাৎ এ-বিয়ের কুড়ি বৎসর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি—যিনি বার্লিন জয় করেন—ঘোষণা করেন যে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে আছে এই দলিলখানা। রুশরাই সর্বপ্রথম বুঙ্কার দখল করেছিল বলে বিয়ের রেজিস্টারখানা তারাই হস্তগত করে।

হিটলার সম্বন্ধে যে কোনো বইয়ে এ দুখানার কপি পাবেন। আমি সংক্ষেপে সারি। সর্বপ্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, 'একথা মিথ্যা যে আমি বা জর্মনির আর কেউ এ যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদি এবং যারা তাদের জন্য কাজ করে তাদের কীর্তি···এখন আমার সৈন্যবল আর নেই বলে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না —ইহুদিরা যাতে করে আমাকে নিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতার জন্য একটা নয়া তামাশা সৃষ্টি না করতে পারে।···তারপর তিনি গ্যোরিঙ ও হিমলারকে নাৎসি পার্টি থেকে ও সর্ব আসন থেকে বিচ্যুত করে বললেন, 'এঁরা যে শক্তিলোভে শত্রুর সঙ্গে গোপন সন্ধি-প্রস্তাব করে শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই নয়, জর্মনি ও তার নাগরিকদের মুখে অমোচনীয় কলঙ্ককালিমা মাখিয়েছেন।' হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল 'যুদ্ধের সাধন কিংবা জীবনপাতন'— সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করাই বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সর্বশেষে তিনি জর্মনদের কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের রক্তে যেন সংমিশ্রণ না হয় তার জন্যে, এবং বিশ্বে বিষসঞ্চারণকারী আন্তর্জাতিক ইহুদিদের নির্দয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দিব্য দিলেন।···এই উইলেই তিনি এডমিরাল ড্যোনিৎসকে দেশের নেতৃত্ব দিলেন, এবং তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করে গেলেন।[১৩]

তাঁর ব্যক্তিগত হ্রস্ব উইলে তিনি এফাকে বিবাহ করার পটভূমি ও কারণ দর্শালেন। তারপর বললেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছেন।' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসি পার্টিকে দান করলেন, পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেলে জর্মন রাষ্ট্রকে, এবং সেও যদি লোপ পায় তাহলে সে বিষয়ে তাঁর আর কোনো নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট চিত্রসঞ্চয় তিনি তাঁর জন্মভূমির লিন্‌ৎস্‌ শহরের যাদুঘর নির্মাণের জন্য দিলেন। দরকার হলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আত্মজন, তাঁর সহকর্মী সেক্রেটারি ইত্যাদি যেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত জীবনযাত্রা করতে পারেন, তার আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি উইলে রাখলেন।···উইল লেখা শেষ হলে ভোর চারটায় তিনি শুতে গেলেন। হায় রে বাসরশয্যা!

গ্যোবেল্‌স্‌ও তাঁর উইল লিখলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য: ফ্যুরার আমাকে আদেশ দিয়েছেন, নূতন মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার (এবং ইচ্ছে করলে তিনি 'শেষবারের' মতোও লিখতে পারতেন; কেন করলেন না, বোঝা ভার) আমি ফ্যুরারের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করছি।

১৩ ড্যোনিৎস এঁদের অধিকাংশকেই গ্রহণ করেননি

আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণসহ ফ্যুরারের পার্শ্বেই জীবন শেষ করবো। এরপর আছে 'সর্বব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা' ইত্যাদি ইত্যাদির কথা।

সেই দিন ২৯শে এপ্রিল। দুপুরের দিকে চারজন বিশ্বস্ত লোক মারফৎ তিনখানা উইল তিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। যে করেই হোক তারা যেন রুশব্যূহ ভেদ করে, কিংবা ব্যূহে কোনো ছিদ্র থাকলে তাই দিলে ড্যোনিৎসের কাছে পৌছয়, নইলে ব্রিটিশ বা মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে।

দুপুরবেলা মন্ত্রণাসভা বসলো। সেখানে প্রধান খবর, রাশানরা এগিয়ে এসেছে এবং ভেংকের কোনোই খবর নেই। তিনজন অফিসার—এঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের পূর্বোল্লিখিত বল্‌ট্‌—বললেন, তাঁরা ভেংকের সন্ধানে ও তাঁকে বার্লিন পানে ধাওয়া করবার জন্য ফ্যুরারের আদেশ পৌছে দিতে প্রস্তুত আছেন। হিটলার অনুমতি দিলেন। রাত্রের মন্ত্রণাসভার পর আরেকজন চলে যাবার অনুমতি পেলেন।

রাত্রের মন্ত্রণাসভায় বার্লিনের কমাণ্ডাণ্ট জানালেন, রাশানরা চতুর্দিক থেকেই শহরের ভিতরে এগিয়ে এসেছে। ১লা মে তারা বুঙ্কার (এবং রাষ্ট্রভবনে) পৌছে যাবে। বার্লিনের ভিতর যে সব জর্মন সৈন্যদল আটকা পড়েছে তারা এই বেলা যদি রুশব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে না যায়, তবে আর কখনো পারবে না। হিটলার বললেন, দু'একজনের পক্ষে কোনোগতিকে বেরোনো সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু এই সব রণক্লান্ত ভাঙাচোরা হাতিয়ারে সজ্জিত—তারও আবার গুলি-বারুদের অভাব—সৈন্যরা দল বেঁধে, তা সে যতই ছোট দল হোক না কেন, কখনই বেরুতে পারবে না। ব্যস্‌, হয়ে গেল ; হিটলারের অভিমতই সর্বশেষ অভিমত। সৈন্যদের কপালে নিরর্থক মৃত্যুর লাঞ্ছন অঙ্কিত হয়ে গেল।

এই সময়ে হিটলার তাঁর সর্বশেষ টেলিগ্রাম পাঠান—জেনারেল ইয়োডল্‌কে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেভার রোপারের মত অতুলনীয় ঐতিহাসিক এই শেষ টেলিগ্রামের উল্লেখ করেননি। বল্‌ট্‌ তো তার আগেই বুঙ্কার ত্যাগ করেছেন—তাঁর কথা ওঠে না। হিটলারের কোনো প্রামাণিক জীবনীতেও আমি এর উল্লেখ পাইনি। শুধু আস্‌মান্‌ ও অন্য এক নৌ-সেনাপতি এর উল্লেখ করেছেন ; আস্‌মান্‌ তাঁর ইতিহাসে টেলিগ্রামখানার ফটোও দিয়েছেন। তাতে হিটলারের সেই আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন, 'ভেংক কোথায়, নবম বাহিনীর পুরোভাগ কোন্‌ কোন্‌ স্থলে পৌচেছে, ইত্যাদি ; আমি এই মুহূর্তেই উত্তর চাই।'

সেইদিনই খবর পৌছল, হিটলার-সখা ডিকটেটর মুস্‌সোলিনীকে মিলানের বিদ্রোহী দল তাঁকে তাঁর উপপত্নীর সঙ্গে ইতালী ছেড়ে সুইটজারল্যাণ্ডে পলায়নের

সময় ধরে দুজনকে খতম করে শহরের মাঝখানের বাজারে পায়ে পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে—যাতে করে উত্তেজিত প্রতিহিংসোন্মত্ত জনগণ দুজনাকে পেটাতে ও পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে। এ সংবাদ হিটলারের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল জানা যায়নি। তবে বহু ডিকটেটরদের শেষ পরিণতি হিটলারের কাছে কোনো নতুন খবর নয়। তাই উইল লেখার সময় ও তার পূর্বেও হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ও একার দেহ যেন পুড়িয়ে এমনভাবে ভস্ম করে দেওয়া হয় যে ইহুদিরা পাগলা জনতাকে তামাশা দেখাবার জন্য কোনো কিছু না পায়। বুঙ্কারের একাধিক বাসিন্দা হুবহু একই ভাষায় এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২৯ তারিখ অপরাহ্ণে হিটলারের আদেশে তাঁর প্যারা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ব্লণ্ডীকে গুলি করে মারা হল। সেইদিনই তিনি তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে চরম সঙ্কটে ব্যবহারের জন্য বিষের ক্যাপসুল দিতে দিতে দুঃখ করে বললেন যে, শেষ বিদায়কালে তিনি এর চাইতে ভালো কোনো উপহার দিতে পারলেন না।

সেই রাত্রে হিটলার ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারবাসীদের খবর পাঠালেন, তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চান, – তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন। রাত আড়াইটার সময় (৩০ এপ্রিল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে) প্রায় কুড়ি জন অফিসার ও মহিলা সারি বেঁধে করিডরে দাঁড়ালেন। বরমান সহ হিটলার বেরিয়ে এসে তাঁদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। হিটলারের চোখের উপর যেন ক্ষীণ বাষ্পের হালকা পরশ লেগে আছে। এ বিষয় এবং তাঁর মৃত্যু, শবদাহ ইত্যাদি অনেকেই সবিস্তর লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকার 'আমি হিটলারকে পুড়িয়েছিলুম' এবং লিঙের কাহিনী। হিটলারের অন্যতম মহিলা সেক্রেটারি ছদ্মনামে 'হিটলার প্রিভাট' অর্থাৎ হিটলারের প্রাইভেট জীবন নিয়ে বই লেখেন। সর্বশেষে হিটলারের নরদানব অ্যাডজুটাণ্ট গ্যুন্‌শের বিবৃতি—রুশ কারাগারে দশ বছর কাটানোর পর জর্মনি ফিরে এসে তিনি বিবৃতি দেন। কিন্তু ট্রেভার রোপার সকলের জবানবন্দি ও বিবৃতি যাচাই করে লিখেছেন বলে তাঁকে অনুসরণ করাই প্রশস্ত। এস্থলে বলে রাখা ভালো হিটলার সপ্তাহখানেক পূর্বে তাঁর চারজন মহিলা সেক্রেটারিকেই বুঙ্কার ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাবার প্রস্তাব করেন। দুজন চলে যান, দুজন থাকেন। নিরামিষাশী হিটলারের জন্য রান্না করতেন ফ্রলাইন মান্‌ৎস্নিয়ালী। তিনিও থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। লিঙেকেও যাওয়া না-যাওয়া তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে

দিয়েছিলেন—তিনি যাননি। ফলে রাশাতে দশ বৎসর কারাভোগ করতে হয়েছিল।

অবধারিত আশু বিপদের সামনে মানুষ সব সময় ভেঙে পড়ে না। জাপানী যখন সিঙ্গাপুর দখল করে তখন সব-কিছু জেনেশুনেই সিঙ্গাপুর-বাসিন্দারা বিশেষ করে ইংরেজগুষ্টি নৃত্য-মদে মত্ত ছিলেন। এস্থলেও তাই হল। হিটলারের বিদায় নেওয়ার পরই সবাই বুঝে গেল, এই শেষ, আর আশানিরাশার কিছু নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুঙ্কারে (হিটলারেরটা প্রথম) তখন আরম্ভ হল জালা জালা অত্যুৎকৃষ্ট মদ্যপান ও গ্রামোফোন যোগে নৃত্য। 'হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়'—এস্থলে 'দু'দিন' শব্দার্থে। ঠিক দু'দিন বাদেই রুশরা বুঙ্কার দখল করে।

৩০ এপ্রিল—শেষ দিন

সকালবেলা জেনারেলরা বার্লিনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খবর নিয়ে মন্ত্রণাসভায় এলেন। অবস্থা আগের চেয়ে সামান্য একটু ভালো, কিন্তু হরেদরে সেই পুরনো কাহিনী—জর্মনরা যদি অসীম বিক্রমে কোনো এক অংশে একটুখানি এগোয় তবে রুশরা আর পাঁচটা দুর্বল জায়গায় তারও বেশী এগিয়ে আসে।

হিটলার আগের রাত্রে যে শেষ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর আসেনি, আর বরমান হিটলারের অনুমতিতে বিনানুমতিতে গণ্ডায় গণ্ডায় যে-সব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তারও কোনো উত্তর নেই।

দুপুরবেলার মন্ত্রণাসভা হিটলারের জীবনের শেষ সভা। এবং সে-সভায় যে খবর সব এলো সে-রকম দুঃসংবাদ তিনি জীবনে আর কখনো শোনেননি (এবং শুনতেও হবে না)। রাষ্ট্রভবন থেকে উত্তরে বেরবার পথে স্প্রে খাল। তার ভাইডেনডামার ব্রিজের কাছে রুশরা এসে গেছে (এই পোলের উপর দিয়েই বরমান এবং কয়েকজন পরের দিন বার্লিন থেকে বেরুনোর চেষ্টা করেছিলেন) —অর্থাৎ উত্তরের পথও বন্ধ হল। এবং রাষ্ট্রভবনের এক কোণ যে ফস্ স্ট্রীটে এসে ঠেকেছে তার অন্য প্রান্তের টানেলের কিছুটা রুশরা দখল করে ফেলেছে। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তে হিটলার সঞ্জয়-বার্তা শুনে গেলেন।

দুটোর সময় হিটলার লাঞ্চ খেতে বসলেন। এফা আসেননি।

তিনি যে মানসিক চঞ্চলতা ও উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন সে-কথা লিঙে বলেছেন। ট্রেভার রোপার ঐতিহাসিক। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে তাঁর কারবার কম—বিশেষ করে এফা যখন ইতিহাসে কোনো অংশ নেননি, তখন তিনি যে তাঁকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু লিঙে

ভ্যালে। তিনি তাঁর বিবৃতিতে যে এফার জন্য একটু বেশী স্থান দিয়েছেন সেটা কিছু বিস্ময়জনক নয়। লিঙে বলেছেন, ঐ শেষের দিনেও তিনি লিঙেকে অনুরোধ করেন, হিটলারকে বুঙ্কার ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা দিতে। এস্থলে অন্য আরেকটি ব্যাপারে ট্রেভার রোপারের সঙ্গে লিঙের কাহিনী মেলে না। ট্রেভার রোপারের মতে গ্যোবেল্‌স্‌ আগাগোড়া হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ না করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লিঙের বিবরণী থেকে জানা যায়, গোড়ার দিকে না হোক অন্তত শেষের দিকে তিনি পর্যন্ত লিঙেকে এফারই মত অনুরোধ জানান, লিঙে যেন হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার কথা বোঝান। লিঙে নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তিনি ফ্যুরারের মন্ত্রী ও নিত্যালাপী হয়েও যে কর্ম সমাধান করতে পারেননি, সামান্য লিঙে সেটা করবেন কি প্রকারে?

লাঞ্চের পর হিটলার যখন বিশ্রাম করছেন তখন ফ্রাউ (মিসেস) গ্যোবেল্‌স্‌ লিঙের হাতে একখানা চিরকুট দেন হিটলারের জন্য। শেষবারের মত একবার দেখা করে যেতে। হিটলার প্রথমটায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পরে সেদিক পানে চললেন। সিঁড়িতে গ্যোবেল্‌সের সঙ্গে দেখা। তিনি হিটলারকে মত পরিবর্তন করতে বললেন। হিটলার অনিচ্ছা জানিয়ে আপন বুঙ্কারে ফিরে এলেন।

এ ঘটনার উল্লেখ আর কেউ করেননি, কারণ লিঙে ভিন্ন আর সবাই ওপারে। ইতিমধ্যে হিটলারের অন্তরতম অন্তরঙ্গ জনা পনেরো বুঙ্কারের করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। হিটলার ও ফ্রাউ হিটলার (এফা) তাঁদের সঙ্গে নীরবে একে একে করমর্দন করলেন। এই শেষ বিদায়। ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ উপস্থিত ছিলেন না। সন্তান ক'টির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন।

বুঙ্কারে সৈন্যসামন্ত এবং তজ্জনিত রূঢ় কঠোর বাতাবরণের ভিতর এসব সুন্দর মধুর বচ্চোদের দেখাতো যেন অন্য কোনো জগতের; কোন বেহেশ্‌তের ফিরিশতা দেবদূতের মত। তারা এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করতো। এক বুঙ্কার থেকে অন্য বুঙ্কার যেতে হলে যেখানে দেশের প্রধান সেনাপতি কাইটেলকেও পাস দেখাতে হত সেখানেও তাদের অবাধ গতি। যে কদিন পাইলট নারী হানা রাইট্‌শ্‌ বুঙ্কারে ছিলেন তারা তাঁর কাছ থেকে কোরাস্‌ গান শিখেছে। তাদের কি ভয়? ঐ তো কাকা আডল্‌ফ্‌ রয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের মত (ঈশ্বর জাতীয় 'কুসংস্কার' গ্যোবেল্‌স্‌ দম্পতি হয়ত বাচ্চাদের জন্য ব্যান করে দিয়েছিলেন! সর্বশক্তিমান; এই তো তারা জন্মের প্রথম দিন থেকে জানে। কাকা হিটলারের অনুকরণে তাদের প্রত্যেকের নাম 'এচ' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ।

শেষ বিদায় নেবার পর একমাত্র তাঁরাই করিডরে রইলেন যাঁরা হিটলারের

শেষ-কৃত্য সমাধান করবেন, অন্যদের বিদায় দেওয়া হল।

হিটলার ও এফা তারপর তাঁদের খাস কামরাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই,—লিঙে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—তিনি হঠাৎ কি এক অজানা ভয়ে করিডর দিয়ে ছুটে পালালেন। অল্পক্ষণের ভিতরই কিন্তু তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হল। তিনি ধীর পদক্ষেপে ফিরে এলেন।

এর পরের ঘটনা দিয়ে, আমরা এ-প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি। মাত্র একটি গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল, এবং লিঙে বলছেন পোড়া বারুদের কটু গন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ভেসে এল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে লিঙে, গ্যান্‌শে, বরমান, গ্যোবেল্‌স্ ইত্যাদি ঘরে ঢুকলেন এবং যা দেখতে পেলেন তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মৃতদেহ দুটি পোড়াবার জন্য দশ লিটার পেট্রল আনতে সেদিন সকালেই হিটলার তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট গ্যান্‌শেকে আদেশ দিয়েছিলেন। গ্যান্‌শে হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকাকে সে আদেশ জানালে তিনি বলেন, অতখানি পেট্রল যোগাড় করা সম্ভব হবে না (রুমানিয়া রাশান হাতে চলে যাওয়ার পর বার্লিন আর কোন পেট্রল পায়নি)। অবশেষে পেতে হবেই হবে আদেশ এলে কেম্পকা অতি কষ্টে ১৮০ লিটার পেট্রল টিনে করে বুঙ্কারের বাইরের বাগানে পাঠিয়েছিলেন। শেষ রেস্ত খতম না হওয়া পর্যন্ত হিটলার যে জুয়োখেলা বন্ধ করেননি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল থেকেই অন্যান্য বুঙ্কার থেকে হিটলার-বুঙ্কারে আসার সব ক'টা পথ তালা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রয়োজনীয় জন ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।

হিটলারের আপন সৈন্যবাহিনী এস. এস. সৈন্য ও লিঙে হিটলারের দেহ কম্বলে জড়িয়ে নিলেন—রক্তমাখা মাথা মুখ ঢাকবার জন্য। পরিচিত কালো পাতলুন পরা পা দুখানা দেখে করিডরে আর সবাই অনায়াসে ইনি যে হিটলার সেকথা বুঝতে পারলেন। চার দফে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এরা পঞ্চাশ ফুট উপরে খোলা বাগানে বেরুলেন। ইতিমধ্যে বরমান এফার দেহ তুলে নিলেন। তিনি বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তাঁর দেহে কোনো রক্তের দাগ ছিল না, এবং দেহটিকে ঢাকবার প্রয়োজন হয়নি। বাগানে এনে তাঁর দেহ হিটলারের দেহের পাশে শোয়ানো হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটি 'দুর্ঘটনা' ঘটে গেল। ম্যাটির উপরে বুঙ্কারের যে প্রহরা মিনার ছিল সেখান থেকে প্রহরারত মান্‌স্‌ফেল্ট নিচে সন্দেহজনক দ্রুত চলাফেরা;

এই দুদিনে বিয়ের রেজেস্ট্রি অফিসার যোগাড় করা সহজ হয়নি। শেষটায় একজন এলেন যাঁকে বুঙ্কারের কেউই চেনে না। গ্যোবেল্‌স্ এঁকে যোগাড় করে এনেছেন; লিঙের মতে ইনিই নাকি একদা গ্যোবেল্‌সের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এমার্জেন্সি বা বিন্‌নোটিসের বিয়ে বলে বহ্বাড়ম্বর আর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দেওয়া হল। দুই পক্ষ মৌখিক—সাধারণতঃ হিটলার-জর্মনিতে সার্টিফিকেট দরকার হত—শপথ দিলেন, উভয়েই অবিমিশ্র 'আর্যরক্ত' ধরেন, ও তাঁদের বংশগত কোনো ব্যাধি নেই। তারপর উভয়ে রেজিস্ট্রিতে সই করলেন। কনে নাম সই করার সময় 'এফা' লিখে 'ব্রাউন' লেখবার জন্যে 'বি' হরফ লিখে ফেলেছিলেন; তাঁকে ঠেকানো হলো, তিনি 'বি' কেটে 'হিটলার' ও 'ব্রাউন নামে জন্ম' (nee) লিখলেন। গ্যোবেল্‌স্ ও বরমান সাক্ষী হলেন।[১২] রাত তখন একটা বেজে গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে।

বিয়ের পর হিটলারের ঘরে পার্টি বসলো। শ্যাম্পেন এল। বহু বৎসর পূর্বে গ্যোবেল্‌স্ যখন বিয়ে করেন তখন হিটলার সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার সেই অবিমিশ্র আনন্দের দিনের সঙ্গে অদ্যকার আনন্দের উপর করাল ছায়ার তুলনা করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। জর্মন ভাষায় একটি সংহিটে আছে, 'চোখের জল নিয়ে আমি নাচছি'—এ যেন তাই। হিটলার আবার তাঁর আত্মহত্যার কথা তুললেন। বললেন, তাঁর জীবনাদর্শ (ভেল্টআনশাউউঙ) নাৎসিবাদ খতম হয়ে গেল; এর পুনর্জন্ম আর কখনো হবে না। তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তিনি এসব থেকে নিষ্কৃতির আরাম পাবেন।

পার্টি চালু রেখে তিনি পাশের ঘরে তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ফ্রাউ য়ুঙেকে নিয়ে তাঁর দুখানা উইল মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন। প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক, দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। পাঠক

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি লিঙের কাছে যে সব করুণ কথা বলেন সেগুলোও পড়ার যোগ্য।...হিটলারের চিকিৎসক মরেলও এফা সম্বন্ধে তাঁর জবানবন্দিতে কিছু কিছু বলেছেন।

১২ কয়েক মাস পূর্বে; অর্থাৎ এ-বিয়ের কুড়ি বৎসর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি—যিনি বার্লিন জয় করেন—ঘোষণা করেন যে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে আছে এই দলিলখানা। রুশরাই সর্বপ্রথম বুঙ্কার দখল করেছিল বলে বিয়ের রেজিস্টারখানা তারাই হস্তগত করে।

হিটলার সম্বন্ধে যে কোনো বইয়ে এ দুখানার কপি পাবেন। আমি সংক্ষেপে সারি। সর্বপ্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, 'একথা মিথ্যা যে আমি বা জর্মনির আর কেউ এ যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদি এবং যারা তাদের জন্য কাজ করে তাদের কীর্তি···এখন আমার সৈন্যবল আর নেই বলে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না —ইহুদিরা যাতে করে আমাকে নিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতার জন্য একটা নয়া তামাশা সৃষ্টি না করতে পারে।···তারপর তিনি গ্যোরিঙ ও হিমলারকে নাৎসি পার্টি থেকে ও সর্ব আসন থেকে বিচ্যুত করে বললেন, 'এঁরা যে শক্তিলোভে শত্রুর সঙ্গে গোপন সন্ধি-প্রস্তাব করে শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই নয়, জর্মনি ও তার নাগরিকদের মুখে অমোচনীয় কলঙ্ককালিমা মাখিয়েছেন।' হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল 'যুদ্ধের সাধন কিংবা জীবনপাতন'— সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করাই বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সর্বশেষে তিনি জর্মনদের কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের রক্তে যেন সংমিশ্রণ না হয় তার জন্যে, এবং বিশ্বে বিষসঞ্চারণকারী আন্তর্জাতিক ইহুদিদের নির্দয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দিব্য দিলেন।···এই উইলেই তিনি এডমিরাল ড্যোনিৎসকে দেশের নেতৃত্ব দিলেন, এবং তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করে গেলেন।[১৩]

তাঁর ব্যক্তিগত হ্রস্ব উইলে তিনি এফাকে বিবাহ করার পটভূমি ও কারণ দর্শালেন। তারপর বললেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছেন।' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসি পার্টিকে দান করলেন, পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেলে জর্মন রাষ্ট্রকে, এবং সেও যদি লোপ পায় তাহলে সে বিষয়ে তাঁর আর কোনো নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট চিত্রসঞ্চয় তিনি তাঁর জন্মভূমির লিন্‌ৎস্‌ শহরের যাদুঘর নির্মাণের জন্য দিলেন। দরকার হলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আত্মজন, তাঁর সহকর্মী সেক্রেটারি ইত্যাদি যেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত জীবনযাত্রা করতে পারেন, তার আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি উইলে রাখলেন।···উইল লেখা শেষ হলে ভোর চারটায় তিনি শুতে গেলেন। হায় রে বাসরশয্যা!

গ্যোবেল্‌স্‌ও তাঁর উইল লিখলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য: ফ্যুরার আমাকে আদেশ দিয়েছেন, নূতন মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার (এবং ইচ্ছে করলে তিনি 'শেষবারের' মতোও লিখতে পারতেন; কেন করলেন না, বোঝা ভার) আমি ফ্যুরারের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করছি।

১৩ ড্যোনিৎস এঁদের অধিকাংশকেই গ্রহণ করেননি

দরজা খোলা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। প্রহরীর কর্তব্য অনুযায়ী অনুসন্ধান করতে নীচে এসে বুঙ্কারের সামনে সে খেল ধাক্কা শবযাত্রার সঙ্গে। এফাকে সে পরিষ্কার চিনতে পারলো এবং কম্বলে ঢাকা শরীর থেকে কালো পাতলুন পরা দুখানা পা ঝুলছে দেখতে পেল। সঙ্গে বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ (পূর্বের সেই পাঁড়-মাতাল), দানব সাইজের অ্যাডজুটাণ্ট গ্যুন্‌শে, ভ্যালে লিঙে। গ্যুন্‌শে হুঙ্কার দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্টকে সরে যেতে বললো। আদর্শনীয় চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা হয়ে গেল মান্‌স্‌ফেল্টের।

বরমান সম্প্রদায় সব আটঘাট বেঁধে ভেবেছিলেন 'সাবধানের মার নেই'।

সপ্রমাণ হল 'মারেরও সাবধান নেই'!

অনুষ্ঠান আবার চললো।

বুঙ্কারের দরজার উপর পর্চ ছিল। দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে দুটি লাশ মাটিতে শুইয়ে তার উপর পেট্রল ঢালা হল। এমন সময় রাশান কামানের বোমা এসে পড়তে লাগল বলে শবযাত্রীরা পর্চের তলায় আশ্রয় নিলেন। ট্রেভার রোপারের মত গ্যুন্‌শে একখানা ন্যাকড়াতে পেট্রল ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সেটা লাশদের উপর ছুঁড়ে ফেললেন। লিঙে বললেন, তিনি খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠে লাশ দুটো ঢেকে ফেললো। পর্চে দাঁড়িয়ে শবযাত্রীদল হিটলারকে শেষ মিলিটারি সেল্যুট দিলেন। তারপর তাঁরা বুঙ্কারের ভিতরে ফিরে গেলেন।

কারনাও নামক আরেকজন সাধারণ প্রহরীরও এসব গোপন অনুষ্ঠান দেখবার কথা নয়। বুঙ্কারের ভিতরকার দরজা তালাবন্ধ দেখে সেও বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আসবার চেষ্টা করে মোড় নিতেই আশ্চর্য হল। হঠাৎ সামনে দেখে দুটি মৃতদেহ পাশাপাশি শুয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ধপ করে জ্বলে উঠলো—বুঙ্কার মিনারের পর্চা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সে দেখতে পায়নি. ওখান থেকেই জ্বলন্ত ন্যাকড়া, কাগজ ছুঁড়ে লাশে আগুন ধরানো হয়েছে। খানিক পর আগুন একটু কমে যেতে সে পরিষ্কার চিনতে পারলো ভগ্ন-মুণ্ড হিটলারের দেহ। প্রহরী কার্‌নাও কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। পরে সে বলে, 'বীভৎসতম দৃশ্য'। গ্যুন্‌শের মত বিরাট-দেহ দানব তাবৎ জর্মনিতেই কম ছিল। অল্পেতে বিচলিত হবার পাত্র নয়। সে পর্যন্ত বলে, 'হিটলারের দেহ-দাহ-দর্শন আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা'।

প্রহরা পুলিসের এক তৃতীয় ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখবার জন্য বুঙ্কারের পর্চে গিয়ে দাঁড়ান কিন্তু মনুষ্যদেহ-বসা পোড়ার দারুণ উৎকট দুর্গন্ধ তাঁকে

সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে।

মিনারের ঘুলঘুলি দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্ট ও কার্‌নাও দেখতে পান, কিছুক্ষণ পরে পরে এস. এস-এর লোক বুঙ্কার থেকে বেরিয়ে 'চিতা'তে আরো পেট্রল ঢেলে দিচ্ছে। তারপর দুজনাতে নিচে নেমে এসে দেখেন, লাশগুলোর পায়ের দিকটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং হিটলারের হাঁটুর হাড় দেখা যাচ্ছে। এক ঘণ্টা পর তাঁরা ফের এসে দেখেন আগুন তখনো জ্বলছে, কিন্তু তেজ কম।

হিটলার আত্মহত্যা করেন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়—লিঙের হিসেবে তিনটে পঞ্চাশে। খুব সম্ভব বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা অবধি পেট্রল ঢালা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেট্রল ফুরিয়ে যাবার পরও দেখা যায়, দেহ দুটো পুড়ে ছাই হওয়া দূরে থাক্, মাসচাম পুড়ে গিয়ে কালো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হিটলারকে যাঁরা কাছের থেকে দেখেছেন তাঁরা তখনো তাঁকে চিনতে পারবেন।

শবদাহকারীগণ পড়লেন বিপদে। হিটলার এ পরিস্থিতির সম্ভাবনা মনশ্চক্ষে দেখেননি এবং সে অনুযায়ী কোনো নির্দেশও দিয়ে যাননি। লিঙে তাঁর বিবৃতিতে হক্ কথা বলেছেন: পেট্রল দিয়ে মানব-দেহ পোড়ানো তো সহজ কর্ম নয়, হিটলার কেরোসিনের ব্যবস্থা করে গেলেন না কেন? লাশ পোড়ানোর অভিজ্ঞতা ভারতের বাইরে কম লোকেরই আছে। এটা যে কত কঠিন কর্ম সেটা যে সব নাৎসি গ্যাস-চেম্বারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে পরে বিরাট বিরাট চুল্লিতে এদের লাশ পোড়ান, তাঁরা, ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমায় জবানবন্দির সময় এ-কথার উল্লেখ করেছেন। এঁদের কর্তা বলেন, 'হাজারখানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমাদের বারো মিনিটেরও বেশী সময় লাগতো না, কিন্তু সেগুলো পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা ছিল অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আমাদের চুল্লীগুলো দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও এদের নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। বিস্তর হাড় চুল্লির তলায় পড়ে থাকতো।' অন্য এক সাক্ষী বলেন, 'সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিল চুল্লীর ধুঁয়ো। মানুষের পুড়ে-যাওয়া ছাই চিমনি দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের নাকে-কানে পোশাকে-আশাকে সর্বত্র ঢুকে পড়তো। পাশের এবং দূরের গাঁয়ের লোকগুলো পর্যন্ত বুঝে যায় যে আমরা কোন্ ব্যবসাতে লিপ্ত আছি।'

হিটলারের অনুচরবর্গ ভাবলেন, তাঁর প্রধান বাসনা ছিল তাঁর দেহ যেন শত্রুহস্তে বর্বর তামাশার বস্তু না হয়; অতএব তাঁকে যদি খুব গোপনে গোর দেওয়া হয়, তবে 'ইহুদি' ও রুশরা তাঁর অর্ধদগ্ধ দেহ খুঁজে পাবে না। সন্ধ্যা মিলিয়ে যাওয়ার পর পুলিসকর্তা রাটেনহুবার গার্ডদের বুঙ্কারে ঢুকে সেখানকার

সার্জেন্টকে বললে, হিটলার দম্পতির লাশ গোর দেবার জন্য তিনজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। তাঁদের নিয়ে যেন তিনি আসেন। এঁদের শপথ করানো হল, তাঁরা সব-কিছু গোপন রাখবেন। নইলে তাঁদের গুলি করে মারা হবে।

এঁদের একজনের নাম মেঙের্‌স্‌হাউজ্‌ন্‌ ও অন্যজন গ্লান্‌ৎসার। দ্বিতীয়জন বার্লিনের রাস্তার যুদ্ধে মারা যান, এবং প্রথমজন রুশহস্তে বন্দী হয়ে রুশদেশে দশ বছর কাটিয়ে পশ্চিম জর্মনিতে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, হিটলারের শরীর সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া দূরে থাক, তাঁকে তখনো চেনা যাচ্ছিল।

বাগানে চিতার কাছে বোমা পড়ে একটা গর্ত হয়েছিল। মেঙের্‌স্‌হাউজ্‌ন্‌ ও গ্লান্‌ৎসার সেটাকে একটা ডবল গোরের সাইজে তিন ফুট গভীর করে খুঁড়লেন। তলায় তক্তা পেতে তার উপর লাশ দুটি রেখে উপরে মাটি চাপা দেওয়া হল।

লিঙে ও রাটেরহুবার রুশদেশে দশ বৎসর বন্দীদশায় কাটিয়ে ফিরে এসে বলেন, তাঁরা ঠিক গোরের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন না বটে তবে বাগানের একটা বোমাতে বানানো গর্তে যে উভয়ের কবর দেওয়া হয় সেটা সত্য। রাটেনহুবার তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন, শেষ মিলিটারি সম্মান দেবার জন্য তাঁর কাছে একখানা স্বস্তিক (হাকেন্‌ক্রয়েৎস—হুক্‌ট ক্রস) পতাকা চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি যোগাড় করতে পারেননি।

মধ্যরাত্রে প্রহরী মান্‌স্‌ফেল্ট আবার প্রহরায় ফিরে এসে আবার মিনারে চড়ল। রাশান বোমা তখনো চতুর্দিকে পড়ছিল ও বিমানবাহিনী আকাশে হাউই ফাটাচ্ছিল। তারই আলোকে সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, লাশ দুটো নেই, এবং বোমাতে খোঁড়া এবড়ো-খেবড়ো গর্তটা পরিপাটি লম্বমান চতুষ্কোণ গোরের আকারে নির্মিত হয়েছে। তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এটা মানুষের হাতের দক্ষ কাজ; আকাশ বা কামান থেকে বোমা পড়ার ফলে এ রকম সুবিন্যস্ত নমুনা তৈরী হতে পারে না।

ওদিকে তার সহকর্মী কার্‌নাও রাষ্ট্রভবনের কাছে সঙ্গীদের নিয়ে প্রহরার রোঁদে বেরিয়েছিল। এদের একজন তাকে বললে, 'ভাবতে দুঃখ হয়, অফিসার-দের একজনও ফ্যুরারের দেহ কোথায় রইল না-রইল সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তাঁর দেহ কোথায় আছে জানি বলে গর্ব অনুভব করি।' (লোকটি হয় মেঙের্‌স্‌হাউজ্‌ন্‌, নয় গ্লান্‌ৎসার)।

কিন্তু যে-ই হোক লোকটির প্রথম বাক্যটি ন'সিকে খাঁটি। হিটলারের মৃত্যুর পর থেকে বাকি সব ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলা ও দরদহীনভাবে করা হয়। এমনিতে জর্মনরা অত্যন্ত পাকা কাজ করতে অভ্যস্ত। তাহলে এমনটা হল কেন? খুব

সম্ভবত লোকে যে বলে হিটলার তার সাঙ্গোপাঙ্গকে (এমন কি বহু বিদেশীকেও) মন্ত্রমুগ্ধ, প্রায় মেস্‌মেরাইজ করে রাখতেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সেই ভানুমতীর ভোজবাজির সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যাজিসিয়ান হিটলার-ভানুমতীও অন্তর্ধান করলেন তখন তারা হঠাৎ সচেতন হল, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে। অন্ধ হোক সত্য বিশ্বাস হোক এতদিন 'গুরুর উপর তারা তাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ? 'ঈচ্ ফর হিমসেলফ্ এ্যাণ্ড ডেভিল টেক দি হাইণ্ডমোস্ট'—'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা, আর শয়তান নিক যেটা সক্কলের পিছনে, যেটা অগা কাঁচা'। বরমান অবশ্য তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু বুঙ্কারের অন্যতম অধিবাসী—সে বেচারী লাটবেলাট কিছুই না, এমন কি সামান্য 'আগডোম বাঘডোমের' ডোম সেপাইও নয়, সে নগণ্য দরজী, য়ুনিফর্ম বানায়, 'রিপুকম্ম' করে—সে বলে, 'নেতৃত্ব কখ্‌খনো এক কানাকড়িরও ছিল না, লোকগুলো হেথাহোথা ছুটোছুটি করছিল মুণ্ডুকাটা মুর্গীর মত।' কিন্তু সেটা তার পরের অধ্যায়ের কাহিনী—সেটা আমি লিখতে যাচ্ছি নে।

আমি শুধু হিটলারের গোর দেওয়ার পরের একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। আনাড়ি হাতে হিটলার-এফার শবদেহ পোড়ানোর অপটু প্রচেষ্টা যথেষ্ট বীভৎস, এটা বীভৎস ও নিষ্ঠুর।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই রাত্রেই বুঙ্কারবাসীর পক্ষ থেকে রুশদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিষ্ফল হয়। শেষ নিষ্ফলতার খবর আসে পরদিন, ১ মে, দুপুরের দিকে।

এবং পূর্বেই বলেছি, গ্যোবেল্‌স্ স্থির করেন যে তিনি সপরিবার আত্মহত্যা করবেন। এখন সে সময় এসেছে। তিনি সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে সপরিবার আপন বুঙ্কারে চলে গেলেন। কোনো কোনো বন্ধু সেখানে তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে নিলেন।

লিঙে বলেন—ট্রেভার রোপার এ-বাবদে স্বল্পভাষী—গ্যোবেল্‌স্ হিটলারের সার্জন ডাক্তার স্টুম্‌প্‌ফ্‌ফেগারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ভিতরে ঢুকতেই গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি বেরিয়ে এলেন। ভিতরে কি হল কেউ সঠিক জানে না।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন—অর্থ, 'হয়ে গেছে'। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ভিতরে কি হয়েছিল, কেউ জানে না, জানবেও না। কারণ ডাক্তার ও গ্যোবেল্‌স্ পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। জনশ্রুতি, ডাক্তার যখন ঘরে

ঢুকলেন তখন বাচ্চারা কফি খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল; তিনি বললেন, 'কফি খাওয়া শেষ হলেই তোমাদের সবাইকে নানা রঙের লজেঞ্চুস দেব। নূতন ধরনের লজেঞ্চুস।' বাচ্চারা সাত-তাড়াতাড়ি তাদের কফি, কোকো, দুধ শেষ করলো। তিনি বিষে-ভরা লজেঞ্চুস দিলেন। নিজে অন্য ধরনের একটা নিলেন। সব্বাইকে একসঙ্গে মুখে পুরতে হবে। ব্যাস হয়ে গেল।...অন্যেরা বলেন, ইনজেকশন দেন, এবং সবচেয়ে বড় মেয়েটি নাকি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নেবে না বলে ধস্তাধস্তি করেছিল। এসব জনশ্রুতির মূলে কি ছিল? যে পাষণ্ড এরকম হীন কাজ করতে পারে সে হয়তো বুঙ্কারে তার পরিচিতদের ভিন্ন জনকে ভিন্ন কথা বলেছিল। যে এসব করতে পারে তার পক্ষে বলাটা আর এমন কি কঠিন কর্ম? কিংবা হয়তো তাঁর এসিসটেণ্ট ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল এবং জনশ্রুতিগুলোর মধ্যে একটা হয়তো তার।

এবং আরেকটা কথা বুঙ্কারের প্রায় সবাই জানতেন। একাধিক রমণী গ্যোবেল্‌স্‌দের সব ক'টি সন্তান একসঙ্গে বা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, ছদ্মনামে বা আপন নামে পালাতে প্রস্তুত ছিলেন। বল্‌ট্‌ বলেছেন, 'গ্যোবেল্‌স্‌ শেষটায় তাঁর আপন প্রোপাগাণ্ডার ফাঁদে বন্দী। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, বার্লিন অজেয়। তারপর শেষ মুহূর্তে যখন বার্লিনে হাজার হাজার অসহায় শিশু রোগে ক্ষুধায় মরছে, তখন তিনি—প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী—আপন সন্তানদের নিরাপদ স্থলে পাঠান কি করে?' আমি বলি, পাঠালে কি হত? দু-চারটা লোক ঠাণ্ডা ব্যঙ্গ করতো। কিন্তু ছ-ছটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বড়, না দুটো হৃদয়হীনের তিনটে মস্করা!

পূর্বেই বলেছি, শিশুগুলোর সব কটারই নাম ছিল হিটলারের আদ্যক্ষর 'এচ' দিয়ে। তারা তাঁর সঙ্গেই গেল।

বেঁচে গেল শুধু একজন। গ্যোবেল্‌সের স্ত্রী তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে লগ্নচ্ছেদ (ডিভোর্স) করে গ্যোবেল্‌স্‌কে বিয়ে করেন। সে-পক্ষের একটি সন্তান ছিল। নাম কোয়াণ্ট্‌। গ্যোবেল্‌স্‌ তাকে খুব স্নেহ করতেন। সে তখন বার্লিন থেকে দূরে। গ্যোবেল্‌স্‌ তার জন্য একখানি সুন্দর চিঠি রেখে যান।

অতঃপর গ্যোবেল্‌স্‌ তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট শ্যাগেরমানকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা; সব কটা জেনারেল ফ্যুরারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের সব-কিছু লোপ হয়ে গেল। আমি সপরিবার আত্মহত্যা করবো। তুমি আমার দেহ পোড়াবার ভার নিতে পারো?" শ্যাগেরমান স্বীকৃত হলেন ও পেট্রলের জন্য লোক পাঠালেন কিন্তু অল্প

পরিমাণেই পাওয়া গেল। প্রায় সাড়ে আটটার সময় গ্যোবেল্‌স্‌ তাঁর স্ত্রীসহ বুঙ্কারের করিডর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চললেন। পথে শ্যুগেরমান ও ড্রাইভারকে পেট্রলসহ দেখতে পেলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না। বাগানে বেরিয়ে তিনি তাঁর অর্ডারলিকে আদেশ দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনা তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। অর্ডারলি দুজনার ঘাড়ের উপর দুটি গুলি মারলো। শ্যুগেরমাদ শব্দ শোনার পর উপরে বাগানে গিয়ে মাটির উপর দুই মৃতদেহ পেলেন। পূর্বাদেশ অনুযায়ী তাঁরে চার টিন পেট্রল—আঠেরো গ্যালন—তাঁদের উপর ঢেলে চলে গেলেন। ঐটুকু পেট্রলে তাঁদের শরীরের চামড়া আর পোশাক পুড়েছিল মাত্র। মৃতদেহগুলো বিনষ্ট করার বা গোর দেবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। রাশানরা পরের দিন সেগুলো বুঙ্কার আক্রমণ করার সময় পায় ও তাঁদের সনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। গ্যোবেল্‌সের ঝলসে যাওয়া শরীরের ফোটো-গ্রাফ কাগজে বেরয়। ভাঙা গাল চওড়া কপাল—চিনতে আমার পর্যন্ত কোনো অসুবিধা হয়নি।

উত্তর হিটলার

হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আবার অন্য অর্থে হয়েও ছিল।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই সর্ব পবিত্র শপথ ভঙ্গ করে একাধিক ব্যক্তি বন্দী-দশায় রাশানদের কাছে হিটলারের শবদাহ ও কবরের গুপ্তভূমির খবর দিয়ে দেন। তারা হিটলার ও এফার মৃতদেহ খুঁড়ে বের করে ও মেঙেরুস্‌হাউজ্‌ন্‌ প্রভৃতিকে দিয়ে সন্দেহাতীতরূপে সনাক্ত করায়।[১৪]

কিন্তু রাশানরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। ইতিহাস তাদের ভালো করেই পড়া। আছে। তারা জানে, এ-যুগে যাকে অপমান করে আগুনে পুড়িয়ে বা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হয়, পরের যুগের লোক তাকেই শহীদরূপে পুজো করে—তার নির্যাতন-ভূমি তীর্থভূমিতে পরিণত হয়।

একজন বিচক্ষণ রুশ জনৈক বন্দী হিটলার-পার্শ্বচরকে বলেন, 'হিটলারের দেহ আমাদের কাছে গোপনে লুকোনো আছে, ভালেই আছে ; তোমরা জর্মনরা শহীদ পূজারী।'

তাই রুশরা হিটলারের দেহ জনগণের তামাশার জন্য বাজারে লটকায়নি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিটলারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে !!

১৪ সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী এবং তার সঙ্গে যায় বুঙ্কার থেকে বরমান, লিঙে ইত্যাদির পলায়নের চেষ্টা। কিন্তু সেটা বর্তমান কাহিনীর অংশ নয়।